খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ) কলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতার নাম সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত মানুষ। কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সন্তান রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই এক অভিজাত পরিমণ্ডলের মাঝে বড় হয়ে ওঠেন। শৈশব-কৈশোরে বিদ্যালয়ের পড়ালেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তেমন মনোযোগী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বেশি দূর অগ্রসর হয়নি।

ঠাকুর বাড়ির অনুকূল পরিবেশ শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৭৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন পনের তখন প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল'। অতঃপর কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, ভ্রমণসাহিত্য, রম্যরচনা, সঙ্গীত ইত্যাদি শাখায় রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন তাঁর অসামান্য শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর।

কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই নয়, একজন কর্মযোগী মানুষ হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কীর্তির পরিচয় রেখে গেছেন। ১৯০১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।' এ বিদ্যালয়ই পরবর্তীকালে 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ রূপলাভ করে। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলি'(১৯১১) কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার রাভ করেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম কৃষিব্যাংক স্থাপন করেন। বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর এবং শাহজাদপুরে জমিদারি তত্ত্বাবধান সূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন।

রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রখরভাবে রাজনীতি সচেতন মানুষ। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ-প্রশাসনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। হিটলার মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও তিনি ছিলেন প্রবলভাবে প্রতিবাদমুখর।

বাংলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের অবদান নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, বাংলা কবিতাকে তিনিই প্রথম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রসারিত করেন। কবিতার বিষয়বস্তু এবং প্রকাশরীতিতে রবীন্দ্রনাথের নিত্য-নতুন পরীক্ষা বাংলা কবিতায় সমৃদ্ধ করেছে। গীতিকার ও চিত্রশিল্পী হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের অবদান অনন্য সাধারণ।

১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য রচনা

কবিতা : মানসী (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৩), চিত্রা (১৮৯৬), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১১) বলাকা (১৯১৬), পুনশ্চ ১৯৩২), জন্মদিনে(১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১)।

উপন্যাস : রাজর্ষি (১৮৮৯), চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯১৬), ঘরে বাইরে (১৯১), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯)।

ছোটগল্প : গল্পগুচ্ছ (১ম খণ্ড- ১৯২৬, ২য় খণ্ড- ১৯২৬), ৩য় খণ্ড- ১৯২৭), সে (১৯৩৭), তিনসঙ্গী (১৯৪১), গল্পসল্প (১৯৪১)।

নাটক : বিসর্জন (১৮৯০), চিরকুমার সভা (১৯০৮), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), ডাকঘর (১৯১২), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬)।
বিজ্ঞান : বিশ্ব পরিচয় (১৯৩৭)।
প্রবন্ধ : আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), কালান্তর (১৯৩৭), সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩)।
ভাষাতত্ত্ব : বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৯০৯), বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮)।

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। অনুকূলবাবুর শিশুপুত্র খোকাবাবু পদ্মা নদীতে পড়ে চিরতরে হারিয়ে যায়। এ-জন্যে ভৃত্য রাইচরণের মনোবেদনার শেষ নেই। খোকাবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই রাইচরণের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। রাইচরণের দৃঢ় বিশ্বাস, খোকাবাবুই তার যন্ণাকে প্রশমিত করার জন্যে তার ঘরে এসে জন্মলাভ করেছে। তাই সে তার পুত্রকে খোকাবাবু জ্ঞানে ভিন্নভাবে আদর-যত্ন আর স্নেহ ভালবাসায় বড় করে তোলে। রাইচরণের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন বিষয়ক ভাবনাই তার পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে। আলোচ্য গল্পের নাম নির্বাচনে রাইচরণের প্রাসঙ্গিক এ ভাবনাই রবীন্দ্র চিত্তে ক্রিয়াশীল ছিল বলে অনুমান করা যায়।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত হয়েছে। গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। সাধু-ভাষায় রচিত এ গল্পে রবীন্দ্র ছোটগল্পের প্রথম পর্বের শিল্পবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আবেগ এবং গীতিময়তা, প্রকৃতি ও মানুষের বিজড়িত অস্তিত্ব, মানব জীবনের বিশেষ কোন পরিণাম সংগঠনে প্রকৃতির ভূমিকা - ইত্যাদি ভাব ও অনুষঙ্গ আলোচ্য গল্পের প্রধান শিল্পলক্ষণ।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন;
২. ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
৩. বিশ শতকের গোড়ার দিকের বাংলাদেশের পারিবারিক সামাজিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অনুকূল বাবুর পরিবারে রাইচরণের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- অনুকূলবাবুর পুত্র খোকাবাবুর শৈশবকালীন চঞ্চলতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাইচরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অনুকূল বাবু ও তার স্ত্রী-র চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
শ্যামচিক্কণ – তেলতেলে বা চকচকে কৃষ্ণবর্ণ। **কায়স্থ** – উচ্চবর্ণের হিন্দু।	**প্রথম পরিচ্ছেদ** রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক।

কালক্রমে – কালে-কালে বা দিনে দিনে।

অধ্যবসায় – তপস্যা, প্রচেষ্টা।

মুন্সেফ – নিম্ন দেওয়ানি আদালতের বিচারক।

উৎক্ষিপ্ত – ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, আকাশে ওড়ানো।

শিরশ্চালন – মাথা, নাড়ানো।

চমৎকৃত – মুগ্ধ, আনন্দিত।

সম্ভাষণ – সম্বোধন।

প্রত্যয়াতীত – বিশ্বাসের অতীত, যা সহসা বিশ্বাস করা যায় না।

অলোকসামান্য – অনন্য সাধারণ, চমৎকার।

প্রত্যক্ষগোচর – যা স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

লুব্ধদৃষ্টি – লোভী দৃষ্টি। এখানে কৌতূহল অর্থে ব্যবহৃত।

প্রত্যাবৃত্ত – পুনরাগমন, ঘুরে আসা। যেখানে ছিল সেখানে পুনরায় আসা।

বিবর্ণ – বর্ণহীন, বিকৃত বর্ণ, নিষ্প্রভ।

উৎকণ্ঠিত – চিন্তিত।

জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বাধিকার যতটা ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে, এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এ ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, 'মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।'

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এ বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার– এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এ যে 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন'। বাস্তবিক, শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত– আবার পরাভুত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এ সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধানক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই– মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চন্ন, ফু।'

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদমম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না– তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'দেখো দেখো ও– দেখো পাখি – ঐ উড়ে – এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়।' এরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা– বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিক ক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, 'তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।' বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ঐ-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্‌ ছল্‌ছল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্‌-এক বৃহৎ রাই-চরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল– দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারো কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'বাবু–খোকাবাবু–লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।'

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এ সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় 'বাবু' 'খোকাবাবু আমার' বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, 'জানি' নে মা।'

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এ কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, 'তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে–তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।' শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকুলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এ অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্য করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, 'কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।'

সার-সংক্ষেপ

মুন্সেফ অনুকূলবাবুর গৃহভৃত্য রাইচরণ। সে শৈশব থেকেই অনুকূলবাবুকে সেবা-যত্নে বড় করে তুলেছে। পরিণত বয়সে বিয়ের পর অনুকূল বাবু এক পুত্র সন্তানের জনক হলেন। পিতার পর এবার তার পুত্রকে বড় করে তোলার ভার পড়লো রাইচরণের উপর। খোকাবাবুর দায়িত্ব পেয়ে রাইচরণও খুব খুশি। সারাদিন খোকাবাবুকে নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। খোকাবাবুর সব আচরণ ও চঞ্চলতায় রাইচরণ খুঁজে পেত নিবিড় আনন্দ, আর তা-ই সগর্বে বলে শোনাত খোকাবাবুর মাকে।

সময় যতই গড়িয়ে চললো, ততই বড় হয়ে উঠলো খোকাবাবু, বাড়লো তার চঞ্চলতাও। ক্রমে সে কথা বলতে শিখলে মাকে বলতো 'মা', 'পিসিকে পিচি', আর রাইচরণকে 'চন্ন'। খোকাবাবুর একমাত্র বন্ধু হয়ে উঠলো 'চন্ন'। খোকাবাবুর বুদ্ধি আর চঞ্চলতা দেখে রাইচরণের বিস্ময় যেন কাটে না।

কিছুদিন পর অনুকূলবাবু পদ্মা-তীরবর্তী এক অঞ্চলে বদলি হলেন। একসময় বর্ষাকাল এলো। অনুকূলবাবুর বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলা পদ্মা নদী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলো। একদিন অপরাহ্নে ঠেলা গাড়িতে করে খোকাবাবুকে নিয়ে পদ্মাতীরে বেড়াতে এলো রাইচরণ। নদীতীরে কদম গাছে ফুল দেখে তা পেড়ে দেবার জন্য বায়না ধরলো খোকাবাবু। কিছুতেই তাকে ভুলাতে না পেরে অবশেষে রাইচরণ কদম গাছে উঠলো ফুল পাড়ার জন্য। যাবার সময় রাইচরণ খোকাবাবুকে জলের কাছে যেতে নিষেধ করলো। ফুল পেড়ে নীচে নেমে খোকাবাবুকে না-পেয়ে রাইচরণ ভীত ও বিহ্বল হয়ে পড়লো। চারদিক খোঁজ করেও খোকাবাবুকে পাওয়া গেল না। অবশেষে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে খোকাবাবুর জননীর পায়ের কাছে পড়ে নীরবে কাঁদতে লাগলো রাইচরণ। সকলেই বুঝলো যে নদীতে পড়েই

খোকাবাবুর মৃত্যু হয়েছে তবু অনুকূলবাবুর স্ত্রীর সন্দেহ হলো যে, হয়তো বা খোকাবাবুর স্বর্ণালঙ্কারের লোভেই রাইচরণ এ-কাজ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. খোকাবাবুর শৈশবকালীন আচরণ কেমন ছিল?
২. খোকাবাবুর শৈশবকালীন আচরণ দেখে রাইচরণের বিস্ময়বোধের পরিচয় দিন।
৩. খোকাবাবুর সঙ্গে রাইচরণের খেলার পরিচয় দিন।
৪. বর্ষাকালে পদ্মার রূপ বর্ণনা করুন।
৫. খোকাবাবুর কীভাবে নদীতে পড়ে গেল?
৬. খোকাবাবুকে না-পেয়ে রাইচরণ কী করলো?
৭. রাইচরণ সম্পর্কে খোকাবাবুর মায়ের সন্দেহ হলো কেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : খোকাবাবুর শৈশবকালীন আচরণ কেমন ছিল?

উত্তর : শৈশবে খোকাবাবু ছিল খুব চঞ্চল। সে হামাগুড়ি দিয়ে অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হোত। এ-সময় কেউ তাকে ধরতে এলে খিল খিল করে হেসে দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করতো। খোকাবাবু যখন একটু একটু করে হাঁটতে শিখলো, তখন তার আচরণ দেখে রাইচরণ অবাক হয়ে যেতো। এ-সময় সে ধীরে ধীরে কথা বলতে আরম্ভ করে। খোকাবাবু প্রথম দিকে মা-কে বলতো 'মা', পিসিকে 'পিচি', আর রাইচরণকে 'চন্ন'।

প্রশ্ন : খোকাবাবুর সঙ্গে রাইচরণের খেলার পরিচয় দিন।

উত্তর : খোকাবাবুর সঙ্গে নানা রকম খেলা করে রাইচরণের দিন কেটে যেত। কখনো কখনো মুখে দড়ি বেঁধে রাইচরণকে ঘোড়া সাজতে হতো। কখনো বা মল্ল সেজে তাকে খোকাবাবুর সঙ্গে কুস্তি করতে হতো। কুস্তি খেলায় রাইচরণকে পরাভূত হয়ে ভূমিতে পড়ে যেতে হতো। তা না হলে খোকাবাবুকে নিয়ে কখনো কখনো ঠেলাগাড়িতে করে নদীতীরেও যেত। এভাবেই খোকাবাবু এবং রাইচরণের খেলা জমে উঠতো।

প্রশ্ন : বর্ষাকালে পদ্মার রূপ বর্ণনা করুন।

উত্তর : বর্ষাকালে পদ্মা নদী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। উন্মত্ত পদ্মার ভাঙনে উদ্যান, গ্রাম, শস্যক্ষেত্র সবই একে একে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পদ্মাতীরবর্তী বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবে যায়। পদ্মার তীরে শোনা যায় অবিরত ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ। জলের গর্জনে দশদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। নদীতে ধাবমান জলের ফেনরাশি দেখা যায়। সব মিলে একটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে বর্ষার পদ্মা নদী।

প্রশ্ন : খোকাবাবুকে না পেয়ে রাইচরণ কী করলো?

উত্তর : নদীতীরে খোকাবাবুকে না দেখে মুহূর্তেই রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। বুক-ভাঙা কান্না নিয়ে সে এদিক ওদিক তাকালো আর উচ্চস্বরে ডেকে উঠলো- "বাবু - খোকাবাবু - লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।" সন্ধ্যা পর্যন্ত উদভ্রান্তের মতো সমস্ত নদীতীরে সে 'বাবু, খোকাবাবু আমার' বলে ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করতে থাকে। অবশেষে ঘরে ফিরে খোকাবাবুর জননীর পায়ের কাছে পড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগলো।

প্রশ্ন : রাইচরণ সম্পর্কে খোকাবাবুর মায়ের সন্দেহ হলো কেন?

উত্তর : খোকাবাবুর যখন রাইচরণের সঙ্গে ঠেলাগাড়িতে করে নদীতীরে বেড়াতে গেলো, তখন তার হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দু'গাছি মল ছিল। খোকাবাবুকে হারিয়ে রাইচরণ যখন ঘরে ফিরল, তখন খোকাবাবুর জননীর সন্দেহ হলো, হয়তো বা ঐ স্বর্ণের লোভেই রাইচরণ খোকাবাবুকে নদীতে ফেলে দিয়েছে। তাই অনুকূলবাবুর প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন- "কেন, তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১ পৃথিবীতে আর-কোন মানব সন্তান যে এ বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

২ সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন ফু"।

৩ কিন্তু ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল।

৪ দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

৫ পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল, খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এ সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

উত্তর

পৃথিবীতে আর কোনো মানবসন্তান যে এ বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে খোকাবাবুর শৈশবকালীন চঞ্চলতা সম্পর্কে রাইচরণের ধারণা ব্যক্ত হয়েছে।

শৈশবে খোকাবাবু ছিল খুবই চঞ্চল প্রকৃতির বালক। হামাগুড়ি দিয়ে সে চৌকাঠ পার হতো। কেউ তাকে ধরতে এলে মুহূর্তেই খিল্ খিল্ করে হেসে সে অন্যত্র পালিয়ে যেত। খোকাবাবুর এসব চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তা দেখে রাইচরণ খুবই বিস্মিত হতো। তার ধারণা হলো, খোকাবাবু বড় হয়ে জজ হবে। খোকাবাবুর জননীর কাছেও এ সম্ভাবনাময় কথা রাইচরণ সগর্বে ঘোষণা করেছে। কেননা, তার ধারণা ভবিষ্যতে একমাত্র এ-ভাবনায় খোকাবাবুর প্রতি তার গভীর ভালোবাসার কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু ওই যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে খোকাবাবুর শৈশবকালীন চঞ্চলতার কথা বলা হয়েছে।

বর্ষাকালের এক বিকেলে খোকাবাবুকে নিয়ে রাইচরণ পদ্মাতীরে বেড়াতে গেল। পদ্মাতীরে কদম গাছে ফুল দেখে রাইচরণকে ফুল পেড়ে দিতে বায়না ধরলো খোকাবাবু। রাইচরণ প্রথমে যেতে চায়নি। কিন্তু খোকাবাবুকে কিছুতেই বোঝাতে না পেরে অবশেষে ফুল পেড়ে আনার সিদ্ধান্ত নিল রাইচরণ। যাবার আগে সে খোকাবাবুকে জলের ধারে যেতে নিষেধ করলো। কিন্তু রাইচরণ গাছে উঠতেই খোকাবাবু জলের কাছে গেল। বস্তুত, রাইচরণের নিষেধই খোকাবাবুকে জলের ধারে যেতে যেন অদৃশ্য আহ্বান জানালো। নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি শিশুর সহজাত আকর্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- অনুকূলবাবুর বাড়ি থেকে চলে যাবার পর রাইচরণের জীবন কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাইচরণের পুত্র ফেল্‌নার শৈশবকালীন অভিজাত পরিমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠার পটভূমি লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
দৈবক্রমে – দেবতার ইচ্ছায়, দেবতার কৃপায়। **লোকলীলা সম্বরণ করিল** – মৃত্যুবরণ করল, ইহজগৎ ত্যাগ করল। **বিদ্বেষ** – হিংসা, ঈর্ষা। **মহাপাতক** – মহাপাপী, মহাপাপ। **অকাট্য যুক্তি** – নির্ভুল যুক্তি। **অনুতাপ** – দুঃখবোধ, যন্ণাবোধ। **উপহাস** – হাসি, তামাশা, কৌতুক। **উন্মত্তবৎ** – পাগলের মতো, উন্মাদের ন্যায়। **জোতজমা** – জায়গা জমি। **হৃষ্টপুষ্ট** – মোটাসোটা, স্বাস্থ্যবান। **শিথিল** – আলগা, এখানে দুর্বল অর্থে ব্যবহৃত। **খুঁতখুঁত** – দোষ ধরা। কোন কিছু মন-মতো না হওয়া। **বসন-ভূষণ** – পোশাক-পরিচ্ছদ।	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই, তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল। এ নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না। আশ্চর্যের বিষয় এ যে, এ ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে। ফেল্‌না– রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না– যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল, 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।' এ বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টলমল্ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে। তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল– আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল। এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে

খেলিতে দিত না; রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকুরি জোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ– কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে– তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়– কিন্তু, যে ব্যক্তি পুরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁতখুঁত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সার-সংক্ষেপ

অনুকূলবাবুর গৃহভৃত্যের চাকরি ছেড়ে রাইচরণ তার গ্রামের বাড়িতে চলে যায়। এ যাবৎ তার কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। কিন্তু হঠাৎ শেষ বয়সে তার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে মারা গেলেন। পুত্রসন্তান পেয়ে রাইচরণ মোটেই খুশি হতে পারলো না। কেননা, তার ধারণা হলো, অনুকূল বাবুর পুত্র হারানোর যন্ণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। কিন্তু তার বিধবা ভগ্নী শিশুটিকে আদর যত্নে বড় করে তুললেন। শিশুটির নাম দেয়া হলো ফেল্‌না।

দিনে দিনে ফেল্‌না বড় হতে লাগলো। অনুকূলবাবুর ছেলের মতোই সে-ও চৌকাঠ পার হতে আরম্ভ করলো, পিসিকে পিসি বলতে শিখলো। এসব দেখে রাইচরণের মনে দ্বিতীয় ভাবনার উদয় হলো। রাইচরণ ভাবলো, খোকাবাবুরই আসলে ফেল্‌নার রূপ ধরে তার সংসারে উপনীত হয়েছে। অতএব এবার সে ফেলনাকে যথাসাধ্য স্বতন্ভাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলো। ফেলনাকে সে বড় ঘরের ছেলের মতো করেই মানুষ করতে লাগলো।

ফেল্‌নার উচ্চশিক্ষার জন্য রাইচরণ জায়গা জমি বিক্রি করে কলকাতা চলে গেল। অতিকষ্টে সে একটা চাকরি জোগাড় করে নিলো। ফেল্‌নাকে হোস্টেলে রেখে পড়ালেখার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করলো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. পুত্র লাভের পর রাইচরণ নিজেকে মহাপাপী বলে মনে করলো কেন?
২. অনুকূল বাবুর ছেলের সঙ্গে রাইচরণের পুত্রের আচরণগত কী সাদৃশ্য ছিল?
৩. খোকাবাবুই যে রাইচরণের ঘরে ফেল্‌না-র রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করেছে, এর সপক্ষে রাইচরণ কী কী যুক্তি দাঁড় করিয়েছে?
৪. ফেল্‌নাকে শিক্ষা লাভের জন্য রাইচরণ কী কী করলো?
৫. ফেল্‌নার কলকাতা বাসের পরিচয় দিন।
৬. "সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে" – কথাটির অর্থ কী?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : পুত্রলাভের পর রাইচরণ নিজেকে মহাপাপী বলে মনে করলো কেন?

উত্তর : স্ত্রীর গর্ভে জাত পুত্র সন্তানের প্রতি রাইচরণ প্রথম থেকেই বিদ্বেষভাব পোষণ করতো। প্রথম দিকে সে ফেলনাকে কোন রকম আদর যত্ন করতো না। রাইচরণ ভাবলো, তার চিত্তলোকে খোকাবাবুর যে আসন, তাই যেন অধিকার করতে ফেলনা তার ঘরে এসেছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, অনুকূল বাবুর পুত্র-হারানোর যন্ণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। এ কারণেই রাইচরণ নিজেকে মহাপাপী হিসেবে কল্পনা করেছে।

প্রশ্ন : অনুকূলবাবুর ছেলের সঙ্গে রাইচরণের পুত্রের আচরণগত কী সাদৃশ্য ছিল?

উত্তর॥ : খোকাবাবুর সঙ্গে ফেলনার শৈশবকালীন অনেক আচরণেই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। খোকাবাবু যেমন চৌকাঠ পার হতে পারতো, তেমনি পারতো ফেলনা। সেও খোকাবাবুর মতো পিসিকে 'পিসি' বলে ডাকতে শিখলো। খোকাবাবু এবং ফেল্‌না উভয়েই শৈশবজীবনে প্রবলমাত্রায় চঞ্চল ছিল।

প্রশ্ন : খোকাবাবুই যে রাইচরণের ঘরে ফেলনার রূপ ধরে জন্মগ্রহণ করেছে, এর পক্ষে রাইচরণ কী কী যুক্তি দাঁড় করিয়েছে?

উত্তর॥ রাইচরণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, খোকাবাবুই ফেল্‌নার রূপ ধরে তার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে। খোকাবাবুর শৈশবকালীন অনেক আচরণের সঙ্গে ফেল্‌নার মিল খুঁজে পেয়েছে রাইচরণ। এ ছাড়া নিম্নোক্ত তিনটি অকাট্য যুক্তিও সে দাঁড় করিয়েছে তার ভাবনার স্বপক্ষে। যুক্তিগুলো হচ্ছে; (১) খোকাবাবুর নিরুদ্দেশ হবার অল্পকাল পরেই ফেলনার জন্ম, (২) বহুবছর পরে প্রায় শেষজীবনে তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তানধারণ এবং ফেল্‌নার জন্ম; (৩) খোকাবাবুর মতোই ফেল্‌না হামাগুড়ি দেয়, টলমল্ করে চলে, পিসিকে পিসি বলে এবং ভবিষ্যৎ জজ হওয়ার মতো আচরণ করে। এসব কারণে রাইচরণ ভেবেছিল যে, খোকাবাবুই ফেল্‌নার রূপ ধরে তার ঘরে এসে জন্মগ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন : "সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" –একথাটির অর্থ কী?

উত্তর : খোকাবাবুর নিরুদ্দেশ হবার অল্প কিছুদিন পরে রাইচরণের পুত্র ফেল্‌নার জন্ম হয়। প্রথম দিকে ফেল্‌নাকে রাইচরণ মোটেই সহ্য করতে পারতো না। তার মনে হতো, অনুকূলবাবুর পুত্র হারানোর যন্ণার দিনে তার পুত্র লাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। কিন্তু আস্তে আস্তে তার ধারণার পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। সে গভীরভাবে লক্ষ করে যে, খোকাবাবু শৈশবে যে সব আচরণ করতো, ফেল্‌নাও সে সব আচরণ করে – সেও চৌকাঠ

পার হয়, পিসিকে পিসি বলে ডাকে আর টলমল করে চলে। তাই রাইচরণ ভাবলে। খোকাবাবুই ফেল্‌নার রূপ ধরে তার ঘরে এসে জন্ম নিয়েছে। এ ভাবনার পিছনে তার অকাট্য যুক্তি ছিল এ খোকাবাবুর তিরোধানের অল্প কিছুদিন পরেই ফেল্‌নার জন্ম হয়। রাইচরণের এ ভাবনার পশ্চাতে তার জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিশ্বাস, খোকাবাবুই ফেল্‌না হয়ে নবজন্ম লাভ করেছে। "সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" –রাইচরণের এ সংলাপ দিয়ে লেখক উপরের কথাই বলতে চেয়েছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক।
২. তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।
৩. আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।
৪. বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন মহাপাতক।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। খোকাবাবুকে হারানোর পর নিজের পুত্রলাভে রাইচরণের অপরাধবোধের কথা এখানে বলা হয়েছে।

খোকাবাবুর তিরোধানের পর রাইচরণ নিজের গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। এতকাল তার কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু তাকে বিস্মিত করে তার স্ত্রী শেষজীবনে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ছেলেটিকে পেয়ে রাইচরণ মোটেই খুশি হতে পারে নি, বরং সে ছেলেটিকে রীতিমতো ঈর্ষা করতো। তার ধারণা হলো, ফেল্‌নাই খোকাবাবুকে মেরে তার ঘরে এসেছে আদর যত্ন পাবার লোভে। রাইচরণ মনে মনে ভাবলো – অনুকূলবাবুর পুত্র হারানোর যন্ণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। এ কারণেই রাইচরণ তার পুত্র ফেল্‌নাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি।

বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছে বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। ফেল্‌নার প্রতি রাইচরণের ভালোবাসা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এখানে উদ্ভাসিত হয়েছে।

খোকাবাবুর তিরোধানের পর নিজের ঘরে ফেলনার জন্মকে রাইচরণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। রাইচরণ মনে মনে ভাবলো – অনুকূলবাবুর পুত্র হারানোর যন্ণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। কিন্তু ক্রমে তার এ মনোভাব পরিবর্তিত হলো। সে লক্ষ করলো, ফেলনাও খোকাবাবুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে চৌকাঠ পার হয়, পিসিকে বলে পিসি। এবার সে ভাবলো ফেলনাই আসলে খোকাবাবু। ফেলনাকে সে খোকাবাবু জ্ঞানে মানুষ করতে থাকে। পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে তাকে মিশতে দিতো না, দামী জামা কাপড় পরতে দিতো, ভালো ভালো খাবার দিতো। ফেল্‌নার যাতে কোন অসুবিধা না হয, সেদিকে রাইচরণের ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ফেল্‌না বড় হলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাকে কলকাতা পাঠানোর উদ্যোগ নিল রাইচরণ। নিজের জায়গা-জমি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করলো, নিজে অতি কষ্টে একটা চাকরিও সংগ্রহ করলো। নিজে কষ্ট করলেও, ছেলেকে তা বুঝতে দেয়নি রাইচরণ। ফেল্‌নাকে সে অনুকূলবাবুর পুত্রজ্ঞানেই আদর যত্ন করতে লাগলো। আর মনে মনে বলতো, বৎস, আমি কষ্ট করলেও তোমার কোন অযত্ন হবে না।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- রাইচরণের শেষ জীবন বর্ণনা করতে পারবেন।
- অনুকূলবাবু এবং তার স্ত্রী ফেল্‌নাকে কিভাবে নিজেদের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাইচরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ ও টীকা	মূলপাঠ
কর্মে জবাব দিল – চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়া, চাকরি ছেড়ে দেয়া। **কাছারি** – বাইরের বসার ঘর। **আর্দ্র হওয়া** – ভিজে যাওয়া, করুণায় ভরে যাওয়া অর্থে। **অন্তঃপুরে** – ভিতরের ঘরে, অন্দরমহলে। **কৃতঘ্ন** – যে উপকারীর অপকার করে। **পরশ্ব** – পরশু। **নিরীক্ষণ** – পর্যবেক্ষণ। **অদৃষ্ট** – কপাল, ভাগ্য।	**তৃতীয় পরিচ্ছেদ** একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছুদিনের মতো দেশে যাইতেছি।' এ বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকুলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন। অনুকুলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহু মূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল 'জয় হোক মা'। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে রে।' রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি রাইচরণ।' বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকুলের হৃদয় আদ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, 'মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।' অনুকুল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না; রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এ আমি–' অনুকুল বলিয়া উঠিলেন, 'বলিস কী রে। কোথায় সে।' 'আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।' সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুকুলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ– বেশভূষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকুলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?

রাইচরণ কহিল, 'এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।'

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পারিবি না।'

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।'

কর্ত্রী বলিলেন, 'আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।'

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, 'যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।'

রাইচরণ অনুকুলের পা জড়াইয়া কহিল, 'আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।'

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে।'

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, 'সে আমি নয় প্রভু।'

'তবে কে।'

'আমার অদৃষ্ট।'

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, 'পৃথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।'

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু, তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, 'বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।'

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল, তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকুল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

সার-সংক্ষেপ

ফেল্‌নার বয়স যখন বারো বছর হলো, তখন রাইচরণ সিদ্ধান্ত নিলো, এবার তাকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুর কাছে নিয়ে যাবে। বারাসতে অনুকূলবাবুর বাড়িতে গিয়ে সে সব কথা তার মতো করে সাজিয়ে বলে। অনুকূল বাবু প্রথমে রাইচরণের কথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ফেলনাকে নিয়ে যখন সে অনুকূলবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলো, তখন ক্রমে অনুকূলবাবুর মনোভাব পরিবর্তিত হতে লাগলো। ফেলনার পোশাক পরিচ্ছদ এবং আচার-আচরণ দেখে তাকে দরিদ্র গৃহভৃত্যের সন্তান বলে মনে হলো না। সব ধরনের জেরার মুখেও রাইচরণ প্রকৃত সত্য প্রকাশ করলো না। কিন্তু

পিতৃহৃদয়ের প্রবল টানে পুত্রের কাছাকাছি থাকার জন্য সে অনুকূল বাবুর বাড়িতে থাকতে চাইলো। কিন্তু রাইচরণের এ মিনতি রাখতে চাইলেন না অনুকূলবাবু।

মুন্সেফের ছেলে হয়েও এতকাল দরিদ্র গৃহভৃত্যের ঘরে থাকতে হয়েছে বলে ফেল্না রাইচরণের ওপর রেগে ছিল। তবু উদারভাবে সে অনুকূলবাবুকে পিতা সম্বোধন করে বললো রাইচরণ চলে যাক। শুধু মাসে মাসে তাকে কিছু টাকা পাঠানো হোক। ফেলনার এ কথায় অনুকূলবাবু রাজি হলেন। পুত্রের দিকে শেষবারের মতো একবার চেয়ে রাইচরণ চলে গেলো। পরের মাসে রাইচরণের ঠিকানায় কিছু টাকা পাঠানো হলো, কিন্তু লোক না থাকায় সে টাকা ফিরে এলো। রাইচরণকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

প্রশ্ন

১. বারাসতে গিয়ে অনুকূলবাবুর কাছে রাইচরণ কী বললো?
২. খোকাবাবু পরিচয়ে ফেলনাকে পেয়ে গৃহকর্মী ও অনুকূলবাবুর মনোভাব কেমন হলো?
৩. রাইচরণ যে ছেলেটিকে এনে দিল, তাকে নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করতে কেন রাজি হলেন অনুকূলবাবু?
৪. অনুকূলবাবুর কাছে রাইচরণের শেষ ইচ্ছা কি ছিল?
৫. রাইচরণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুকূলবাবু এবং তার স্ত্রী কী বললেন?
৬. রাইচরণের কাছে পাঠানো টাকা ফিরে এলো কেন?

নমুনা উত্তর

প্রশ্ন : বারাসতে গিয়ে অনুকূলবাবুর কাছে রাইচরণ কী বললো?

উত্তর : ফেলনার বয়স যখন বারো বছর পূর্ণ হলো, তখন তাকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুর কাছে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিল রাইচরণ। তখন সে অনুকূলবাবুর কর্মস্থল বারাসতের বাড়িতে গেলো। সে অনুকূলবাবু এবং তার স্ত্রীর কাছে বললো যে, "আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এ আমি –।" একথা বলে রাইচরণ মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে রাইচরণ তার অপরাধের কথা স্বীকার করলো।

প্রশ্ন : খোকাবাবু পরিচয়ে ফেল্নাকে পেয়ে গৃহকর্ত্রী ও অনুকূলবাবুর মনোভাব কেমন হলো?

উত্তর : খোকাবাবু পরিচয়ে ফেল্নাকে পেয়ে অনুকূলবাবু প্রথমে বিস্মিত হলেন। তিনি কিছুতেই রাইচরণ আনীত ফেল্নাকে খোকাবাবু বলে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই সে রাইচরণের কাছে প্রমাণ চাইলো– আনীত ছেলেটিই খোকাবাবু কিনা। অপরদিকে গৃহকর্ত্রী কোন রকম বিচার না করেই ফেল্নাকে খোকাবাবুজ্ঞানে গ্রহণ করলেন। ছেলেটিকে কোলে বসিয়ে, নানাভাবে স্পর্শ করে, তার ঘ্রাণ নিয়ে, অতৃপ্ত নয়নে তার মুখ নিরীক্ষণ করে, কেঁদে-হেসে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ছেলেটিকে পেয়ে গৃহকর্ত্রী আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলো। মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটির পোশাক-পরিচ্ছদ এবং হাব-ভাব যেমন, তাতে নিশ্চিত যে এ ছেলেটিই তার হারিয়ে যাওয়া খোকাবাবু।

প্রশ্ন : রাইচরণ যে ছেলেটিকে এনে ছিল, তাকে নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করতে কেন রাজি হলেন অনুকূলবাবু?

উত্তর : রাইচরণ কর্তৃক আনীত ছেলেটিকে নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করতে রাইচরণ প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু আস্তে আস্তে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটলো। অনুকূলবাবু মনে মনে ভাবলেন, ছেলেটিকে পাওয়ামাত্র তার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে আগলে ধরেছেন, সেক্ষেত্রে প্রমাণ সংগ্রহ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অতএব, এখন বিশ্বাস করাই ভালো। এ ছাড়া তিনি ভাবলেন, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাবে? তিনি ছেলেটির কাছে জিজ্ঞাসা করে আরও জানতে

পেরেছেন যে, শিশুকাল থেকেই সে রাইচরণের কাছেই বড় হয়েছে। রাইচরণকেই সে পিতা বলে জানতো, কিন্তু রাইচরণকে সে কখনোই পিতার ন্যায় ব্যবহার করতে দেখে নাই, বরং অনেকটা ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতো। এসব কারণে রাইচরণ আনীত ছেলেটিকে অনুকূলবাবু নিজের ছেলে বলে বিশ্বাস করলেন।

প্রশ্নঃ রাইচরণের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুকূলবাবু এবং তার স্ত্রী কী বললেন?

উত্তর : রাইচরণ যখন বুঝতে পারলো যে ফেল্না অনুকূল বাবুর ঘরে খোকাবাবু পরিচয়ে আশ্রয় পাবে, তখন তার হৃদয়ে দেখা দেয় শূন্যতার উপলব্ধি। শেষজীবনে যাতে ছেলেকে দেখতে পায়, তাই সে বাকি জীবনটুকু অনুকূলবাবুর বাড়িতেই থাকতে চেয়েছে। কিন্তু তার এ অনুরোধে অনুকূলবাবু রাজি হননি, তাই রাইচরণকে তিনি বললেন– "রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পারিবি না।" ঈশ্বরের উপর দোষ চাপানোর অপচেষ্টা দেখে তিনি বিরক্ত হয়ে রাইচরণকে আরও বললেন যে, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে, তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।" অন্যদিকে গৃহকর্ত্রী ছিলেন রাইচরণের উপর খুবই রাগান্বিত। কিন্তু ফেল্নাকে কোলে পেয়ে তার চিত্ত উদার হয়ে গেল। তাই রাইচরণের অন্তিম অনুরোধে অনুকূলবাবু যখন রাজি হলেন না, তখন গৃহকর্ত্রী বললেন, "আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হইক। ওকে আমি মাপ করিলাম।"

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১. গৃহিনী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষে লালন করিতেছিলেন।
২. অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।
৩. যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।
৪. ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল, তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল।

উত্তর

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে খোকাবাবু পরিচয়ে ফেল্নাকে পেয়ে অনুকূলবাবুর স্ত্রীর আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে।

ফেল্নার বয়স যখন বারো বছর পূর্ণ হলো, তখন রাইচরণ তাকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুকে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। তাই একদিন সে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অনুকূলবাবুর বারাসতের বাড়িতে গিয়ে উপনীত হলো। খোকাবাবু রূপী ফেল্নাকে পেয়ে অনুকূলবাবুর আনন্দ আর কে দেখে। কোনরূপ প্রমাণ বা বিচার না করেই তিনি ফেলনাকে কোলে বসিয়ে নানা ভাবে আদর করে এতদিনের হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে দেখতে লাগলেন। এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনুকূলবাবুর স্ত্রীর পুত্রস্নেহের প্রাবল্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে রাইচরণের প্রতি অনুকূলবাবুর সন্দেহপ্রবণতা এবং বিশ্বাসহীনতার ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

খোকাবাবু পরিচয়ে ফেলনাকে পেয়ে রাইচরণ ও তার স্ত্রী যার পর নাই খুশি হলেন। পুত্রকে হারিয়ে রাইচরণের হৃদয় শূন্যতায় ভরে গেল। বাকিজীবন পুত্রের কাছে থাকার জন্য সে অনুকূলবাবুর বাড়িতেই আশ্রয় প্রার্থনা করলো। কিন্তু

একবার খোকাবাবুকে কথিত চুরি করার কারণে অনুকূলবাবু কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, নতুন কোনো উদ্দেশ্যে রাইচরণ তার বাড়িতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। পুত্রকে একবার হারিয়ে যে যন্ণা তিনি ভোগ করেছেন, পুনরায় সে যন্ণা তিনি পেতে চাইলেন না। তাই তিনি রাইচরণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যে একবার ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাকে আর কোনো ভাবেই বিশ্বাস করা যায় না। কারণ সে ভবিষ্যতে আবার একই ধরনের বিশ্বসঘাতকতার কাজ করতে পারে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।
২. রাইচরণ-চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।
৩. অনুকূলবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করুন।
৪. অনুকূলবাবুর স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।
৫. ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের আলোকে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের সার্থকতা বিচার করুন।

প্রশ্ন : 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : কোনো ছোটগল্প বা উপন্যাসের নামকরণের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যিকরা কয়েকটি দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন। কখনো নায়ক নায়িকা বা বিশেষ কোনো চরিত্র, কখনো ঘটনা সংঘটনের স্থান বা পরিবেশ, কখনো বা অন্তর্নিহিত ভাবকে অবলম্বন করে ছোটগল্প বা উপন্যাসের নামকরণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে শেষোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় ভাবকে অবলম্বন করেই এর নামকরণ করা হয়েছে– 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'।

মহকুমা মুন্সেফ অনুকূলবাবুর গৃহভৃত্য রাইচরণ। দীর্ঘদিন ধরে তিনি অনুকূলবাবুর পরিবারে কাজ করে আসছেন। অনুকূলবাবুকে ছোটবেলা থেকে তিনি দেখাশোনা করেছেন। অনুকূলবাবুর পর এবার তার সন্তান খোকাবাবুকে লালন-পালনের দায়িত্ব পড়লো রাইচরণের উপর। রাইচরণের সঙ্গেই কেটে যায় খোকাবাবুর সারাটি দিন। খোকাবাবুর সকল আবদার সে মিটিয়ে দেয়, খোকাবাবুকে আনন্দ দিতেই রাইচরণের যত আনন্দ।

অনুকূলবাবুর বাড়ি ছিল পদ্মানদীর তীরে। একদিন অপরাহ্নে খোকাবাবুকে নিয়ে রাইচরণ পদ্মার তীরে বেড়াতে গেল। বর্ষার পদ্মা জলে পরিপূর্ণ। পদ্মার তীরে একটা কদম গাছে কদমফুল দেখে তা পেড়ে দেয়ার জন্য খোকাবাবু আবদার করলো। অনেক চেষ্টা করেও খোকাবাবুকে নিবৃত্ত করতে না পেরে রাইচরণ খোকাবাবুকে নিচে রেখে কদমগাছে উঠলো ফুল পেড়ে দিতে। যাবার সময় সে খোকাবাবুকে নদীর কাছে যেতে নিষেধ করে গেল। কিন্তু এ নিষেধের আকর্ষণেই খোকাবাবু জলের কাছে গেল এবং এক সময় নদীতে পড়ে ভেসে গেল। অতঃপর অনুকূলবাবুর স্ত্রীর প্রবল রাগের মুখে রাইচরণ গৃহভৃত্যের কাজ ছেড়ে দিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে এলো।

রাইচরণ ছিল সন্তানহীন। কিন্তু গ্রামের বাড়িতে আসার কিছুদিন পরে তার স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। রাইচরণ প্রথমে তার পুত্র ফেল্‌নাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু ক্রমে লক্ষ করলো, খোকাবাবুর শৈশবকালীন নানা গুণই ফেলনার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার বিশ্বাস হলো যে, খোকাবাবুই ফেল্‌না রূপে তার ঘরে এসে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। অতএব এবার থেকে সে ফেল্‌নাকে খোকাবাবু জ্ঞানে মানুষ করতে লাগলো। পাড়ার অন্য ছেলেদের সাথে ফেলনাকে মিশতে দিতে না। সব সময় দামি পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়ে রাখতো ফেলনাকে। বড় হলে নিজের জায়গা জমি বিক্রি করে ফেল্‌নাকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। নিজেও কোন রকমে একটা কাজ সংগ্রহ করে কলকাতায় থেকে গেল। বড় ঘরের ছেলের মত যাতে বড় হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে রাইচরণ হয়ে উঠলো বিশেষ বিশেষ যত্নশীল।

এভাবে বারো বছর কেটে যাবার পর রাইচরণ এক কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। নিজের ছেলেকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুকে ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। ফেল্‌নাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সে অনুকূলবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলে। খোকাবাবু পরিচয়ে ফেলনাকে পেয়ে অনুকূলবাবু ও তার স্ত্রী আবেগে স্নেহে ভালবাসার বেদনায় আপ্লুত হলো। ঘরের ছেলে এতকাল পরে আবার ঘরে ফিরে এসেছে। যে ছেলেকে মনে করা হয়েছিল চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে, সে ছেলে ঘরে ফিরেছে। এ সূত্রেই গল্পের নাম রাখা হয়েছে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। অতএব, এ কথা অনস্বীকার্য যে, গল্পের নামকরণ সুন্দর ও সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন : রাইচরণ চরিত্র ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মুন্সেফ অনুকূলবাবুর গৃহভৃত্য রাইচরণ। যশোর জেলার অধিবাসী এ মানুষটি বারো বছর বয়সেই অনুকূলবাবুদের পরিবারে গৃহভৃত্যের কাজে যোগ দেয়। দীর্ঘদিনের পরিচয়ে ও কর্মের মাধ্যমে সে সকলের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়, হয়ে ওঠে পরিবারের একজন সদস্য।

রাইচরণ ছিল কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ। অনুকূলবাবুকে শৈশবে সে যেমন সযত্নে বড় করে তুলেছে, তেমনি সযত্নে বড় করে তুলেছে অনুকূলবাবুর পুত্র খোকাবাবুকে। তার সঙ্গেই কেটে যায় রাইচরণের সারাটা দিন। এক মুহূর্তের জন্যও খোবাবুকে সে চোখের আড়াল করেনি। খোকাবাবুর সকল শৈশবকালীন চঞ্চলতার মধ্যে সে খুঁজে পেত অনাবিল আনন্দ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় লেখকের বর্ণনা "অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিলখিল হাস্য কলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচার শক্তি দেখিয়া চমৎকৃৎ হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

রাইচরণ ছিলো অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন মানুষ। খোকাবাবুর তিরোধানের পর যখন সকলেই অবিশ্বাস করতে লাগলো, তখন তার বলার বা করার কিছুই ছিল না। কিন্তু গৃহকর্ত্রী যখন তাকে সন্দেহ করলো এবং টাকার বিনিময়ে খোকাবাবুকে ফিরিয়ে দেবার কথা বললো, তখন তার বেদনার আর সীমা থাকলো না। তার প্রতি মাঠাকুরাণীর এ অবিশ্বাস তাকে বিস্মিত করলো। অন্যদিকে, ফেলনাকে খোকাবাবু পরিচয়ে অনুকূলবাবুর কাছে বুঝিয়ে দেয়ার পর রাইচরণ যখন অনুকূলবাবুর বাড়িতে বাকি জীবনটা কাটাতে চাইলেন, তখন অনুকূল বাবু কিছুতেই রাজি হলেন না। বরং তিনি বললেন, রাইচরণের প্রতি বিশ্বাসহীনতার কথা। "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।" – অনুকূলবাবুর এ কথা রাইচরণকে সীমাহীন যন্ণা দিয়েছে। এ কথার পরই সে সবার সামনে থেকে চিরদিনের জন্য দূরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাজেই যে মানুষ ছিল সবচেয়ে বেশি বিশ্বাসভাজন, সেই পরিণতিতে বিশ্বাসঘাতক মানুষ হিসেবে পরিগণিত হলো। এটাই বোধ করি রাইচরণ চরিত্রের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিক পরিণতি।

কৃতজ্ঞতাবোধ রাইচরণ চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তার সামান্য অবহেলার কারণে খোকাবাবু পদ্মায় পড়ে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল। এ অপরাধবোধে সে সারাজীবন জ্বলেছে। তাই দীর্ঘকাল পরে জীবনের শেষলগ্নে পুত্রসন্তান লাভ করেও সে খুশি হতে পারেনি। নিজের পুত্র ফেল্‌নাকে সে রীতিমতো ঈর্ষা করতো। কেননা, তার ধারণা হলো, অনুকূলবাবুর পুত্র হারানোর যন্ণার দিনে তার পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ রীতিমতো অন্যায়। অনুকূলবাবুর প্রতি এতই সুগভীর ছিল রাইচরণের কৃতজ্ঞতাবোধ। এ কৃতজ্ঞতাবোধের তাড়নাতেই সে নিজের পুত্রকে অনুকূলবাবুর হাতে তুলে দিয়েছে মিথ্যা ঘটনার জাল বিস্তার করে। নিজের পুত্রকে অন্যের হাতে তুলে দেয়ার সময় পিতৃহৃদয়ের যন্ণার কথা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু একজন সাধারণ গৃহভৃত্য তার সুগভীর অন্তর উপলব্ধিতে অন্য এক পিতৃহৃদয়ের যন্ণা অনুভব করতে পেরেছে। এভাবেই সে হয়ে উঠেছে সাধারণের সীমানা ছাড়ানো এক অসাধারণ চরিত্র।

ধর্মপ্রাণ রাইচরণ বিশ্বাসী মানুষ। সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে জন্মান্তরবাদে। তাই প্রথম দিকে ফেল্‌নাকে ঈর্ষা ও অবহেলা করলেও, ক্রমে যখন ফেলনার মধ্যে খোকাবাবুর শৈশবকালীন অনেক আচরণের মিল খুঁজে পেল, তখন তার ধারণা হলো, খোকাবাবুই ফেলনা হয়ে তার ঘরে এসে জন্মলাভ করেছে। প্রসঙ্গত, রাইচরণের অন্তর্ভাবনা উপস্থাপন করা যায়– "ফেল্‌না .... যথা সময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল– 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই

জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" জন্মান্তরবাদে এ বিশ্বাসের কারণেই সে ফেল্‌নাকে খোকাবাবু জ্ঞানে মানুষ করেছে, বড় করে তুলেছে অভিজাত পরিমণ্ডলে।

রাইচরণ গৃহভৃত্য হলেও অনেক বিশাল মনের মানুষ। তাই অনুকূলবাবুর বাড়িতে তার শেষ আশ্রয় যখন মিললো না, তখন তার কয়েকটি টাকার সহানুভূতিকে সে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পেরেছে। টাকার বিনিময়ে সে তার পিতৃহৃদয়কে অপমানিত করেনি। সামান্য মানুষ রাইচরণকে রবীন্দ্রনাথ এভাবে অসামান্য মানুষ হিসেবে নির্মাণ করেছে।

প্রশ্ন : ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যর আলোকে 'খোকাবাবুর প্রত্যার্বতন গল্পের সার্থকতা বিচার করুন।

উত্তর : ছোটগল্প হচ্ছে মানবজীবনের বিশেষ কোনো মুহূর্ত বা খণ্ডাংশের শিল্পরূপ। বিশেষ মুহূর্ত বা খণ্ডাংশকে নিয়ে রচিত হলেও ছোটগল্পের অবয়বে গোটা মানবজীবন সম্পর্কে আমরা লেখকের বিশেষ কোনো দৃষ্টিভঙ্গির ছায়াপাত লক্ষ করি। অর্থাৎ খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের একটা ব্যঞ্জনা নির্মাণই ছোটগল্পের অন্যতম শিল্প বৈশিষ্ট্য। ছোটগল্পের ক্ষুদ্র আকৃতির মধ্যে এভাবে বৃহত্তর জীবন প্রতিবিম্বিত হয়, পদ্মপাতার শিশিরে যেমন হেসে ওঠে প্রভাতের সম্পর্ণ সূর্য। ছোটগল্পের মধ্যে মানবজীবনের ছোট ছোট দুঃখ-কথা ও আনন্দ-বেদনার ভাষাচিত্র অঙ্কিত হয়। ছোটগল্প শেষ হলেও একটা অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা গল্পটিকে ঘিরে থাকে। ছোটগল্পের এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমরা এবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, গল্পের সার্থকতা বিচার করবো।

রাইচরণের জীবনের ছোট্ট একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আলোচ্য গল্প। তার সামান্য অবহেলার কারণে খোকাবাবুর হারিয়ে যাওয়া এবং সে কারণে অপরাধবোধই এ গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয়। অথচ গল্প যখন শেষ হয়, তখন আমরা কৃতজ্ঞতাবোধে মহীয়ান অসামান্য এক মানুষ রাইচরণের সাক্ষাৎ পাই। রাইচরণ গৃহভৃত্য হলেও অনেক বিশাল মনের মানুষ। তাই অনুকূলবাবুর বাড়িতে তার শেষ আশ্রয় যখন মিললো না, তখন তার কয়েকটি টাকার সহানুভূতিকে সে তার পিতৃ হৃদয়কে অপমানিত করেনি। সামান্য মানুষ রাইচরণের মধ্যে এ অসামান্যতা আরোপ করে রবীন্দ্রনাথ মূলত মানবজীবনের মহানুভবতার কথাই ব্যক্ত করেছেন। এখানেই নিহিত আছে এ গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনা তথা গভীর জীবনদর্শন। এভাবে খণ্ড ঘটনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড এক উপলব্ধি আরোপ করে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটিকে সার্থক করে তুলেছেন।

ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আকৃতিগত সংক্ষিপ্ততা। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পও আকৃতিতে ছোট। কাজেই ছোটগল্পের অবয়বগত এ বৈশিষ্ট্যের আলোকেও 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনকে সার্থক গল্প হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

অন্তিমে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য শিল্প বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'শেষ হয়েও হইলো না শেষ' – এ অতৃপ্তিই ছোটগল্পের প্রাণ। আলোচ্য গল্পেও আমরা এ অতৃপ্তির বেদনায় নিমগ্ন হই। রাইচরণের কাছে পাঠানো টাকা ফেরৎ এলো। কিন্তু রাইচরণ কোথায় গেল? ফেল্‌না খোকাবাবু হিসেবে অনুকূলবাবুর পরিবারে মিশে যেতে পারলো কি? গৃহকর্ত্রী ছেলেকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারলো কি? অনুকূলবাবুর সন্দেহ দূর হলো কি? –এসব নানা প্রশ্নের আমরা কোনো উত্তর খুঁজে পাই না। এ অতৃপ্তিই 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পকে আরও সার্থক করে তুলেছে।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

প্রশ্ন

১. বাক্য কাকে বলে? বাক্য কত প্রকার? খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্প থেকে প্রত্যেক প্রকার বাক্যের দুটি করে উদাহরণ দিন।

২. সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লিখুন। নিম্নের অংশগুলো চলিত ভাষায় রূপান্তর করুন –

ক) তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল, তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

খ) বর্ষাকাল আসিল ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকা চরের কাশবন এবং বন ঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড়-ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

গ) অনুকূল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এ অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিনী বলিলেন, "কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

৩. নিচের শব্দগুলো পাঁচটি করে সমার্থ শব্দ লিখ–
নদী, জননী, জল, ফুল, মেঘ, সূর্য, ভগ্নী, বিশ্বাস।

৪. বিশিষ্ট অর্থে বাক্যে প্রয়োগ দেখান –
গদ্‌গদ কণ্ঠ, ছায়া মাড়ানো, দারুণ সন্দেহ, খুঁত খুঁত করা, কৃতঘ্ন অধম।

উত্তর

প্রশ্ন : বাক্য কাকে বলে? বাক্য কত প্রকার? খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন গল্প থেকে প্রত্যেক প্রকার বাক্যের দু'টি করে উদাহরণ দিন।

উত্তর : কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে যদি একটা সম্পর্ণ ভাব প্রকাশ করে, তবে তাকে বাক্য বলে। বাক্য তিন প্রকার। যথা– সরল বাক্য, জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য।

সরল বাক্য–

ক) বর্ষাকাল আসিল।

খ) রাইচরণ জরির টুপি আনিল।

জটিল বাক্য

ক) ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল।

খ) মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল।

যৌগিক বাক্য

ক) পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

খ) ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

প্রশ্ন : সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য লিখুন। নিম্নের অংশগুলো চলিত ভাষায় রূপান্তর করুন–

উত্তর : সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ ব্যবহারের মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথের মতে, "সাধু ভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে।" সাধুভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ সাধারণত দীর্ঘ হয়, পক্ষান্তরে চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ সংক্ষিপ্ত হয়। সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিম্নে সূত্রাকারে উল্লেখ করা হলো –

সাধুভাষা	চলিতভাষা
১. সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি। ২. সাধুভাষায় সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ	১. চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রাধান্য বেশি।

পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন করিয়া, করিয়াছি, করিতেছি ইত্যাদি। ৩. সাধুভাষায় সর্বনাম পদ পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন–তাহারা, তাহাতে, কাহারা ইত্যাদি। ৪. সাধুভাষার চাল গুরু গম্ভীর।	২. চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– করে, করেছি, করছি ইত্যাদি। ৩. চলিত ভাষায় সর্বনাম পদ সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– তারা, তাতে, কারা ইত্যাদি। ৪. চলিত ভাষার চাল অপেক্ষাকৃত লঘু।

সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর। ক-অংশের রূপান্তর দেখানো হলো, বাকি অংশদ্বয় নিজে করুন।

সাধুভাষা

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর ওপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল, তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

চলিত ভাষা

তার আর একটি মনিব বেড়েছে, মা-ঠাকুরাণী ঘরে এসেছেন। তাই অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের আগে যতটা অধিকার ছিল, তার অনেকটাই নতুন কর্ত্রীর হাতে গিয়েছে।

প্রশ্ন : নিচের শব্দগুলোর পাঁচটি করে সমার্থ শব্দ লিখ–

নদী, জননী, জল, ফুল, মেঘ, সূর্য, ভগ্নী, বিশ্বাস।

উত্তর

জল – সলিল, পানি, অম্বু, বারি, জীবন।

জননী – মা, মাতা, আম্মা, প্রসূ, গর্ভধারিনী।

মেঘ – জলদ, জলধর, ঘন, জীমূত, অভ্র।

[বাকি শব্দগুলোর সমার্থ শব্দ অভিধান দেখে নিজে লিখুন।]

সৃজনশীল কাজ

১. আপনার জানা কোন গৃহভৃত্য সম্পর্কে একটি ছোটগল্প রচনা করুন।

আরও যা পড়তে পারেন

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছের' গল্পগুলো পড়ুন।

বিলাসী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে শরৎচন্দ্র লেখাপড়ায় বেশি অগ্রসর হতে পারেননি। অল্প বয়স থেকেই তাঁকে অর্থোপার্জনে মন দিতে হয়। তিনি জীবনের প্রথম দিকে একটি জমিদারী এস্টেটে সামান্য চাকুরিতে যোগদান করেন। কিন্তু এ কাজে তাঁর মন বসেনি। অল্পকাল পরেই তিনি চাকুরি ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু, এ বৈরাগ্যময় জীবনেও তাঁর মন টিকলো না। অবশেষে, তিনি সমুদ্র পথে বার্মায় রেঙ্গুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। রেঙ্গুনে একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে তিনি চাকুরিতে নিয়োজিত হন। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র দীর্ঘ বার-তের বৎসর অবস্থান করেন।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসাবে পরিচিত। বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ বেদনার ভাষাকে তিনি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে অংকিত করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের কথাকে সাবলীল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় উপস্থাপনার কৌশলে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যে কারণে, আজও শরৎচন্দ্র সকল বাঙালি পাঠকের কাছে আদরনীয়। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তিনি কল্পনার জগৎ থেকে সাহিত্যের বিষয়বস্তুকে মাটির জীবনের কাছে নামিয়ে এনেছেন। সাধারণ বাঙালি জীবনের দৈনন্দিন হাসি-কান্নার উপাখ্যান প্রীতি ও করুণার রসে সিক্ত করে তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি, পথ নির্দেশ, বিন্দুর ছেলে, বড় দিদি, মেজদিদি, মামলার ফল, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল ইত্যাদি গল্প বাঙালি পরিবারের বৈচিত্র্যময় জীবনের গতিপথের অপরূপ আলেখ্য। উপন্যাসের মধ্যে দেবদাস, পল্লীসমাজ, দত্তা, গৃহদাহ, শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, দেনা-পাওনা, ইত্যাদি বহুল সমাদৃত। তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করে।

১৯৩৭ সালের ১৬ জানুয়ারি (১৩৪৪ বাংলা সনের ২ মাঘ) তারিখে কলকাতার পার্ক নার্সিং হোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভূমিকা

সেবা, স্নেহ, ভালোবাসা, ব্যক্তিত্বে ও ত্যাগে এক উজ্বল চরিত্র শরৎচন্দ্রের বিলাসী। কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারেই লেখক গল্পের নামকরণ করেছেন। সমগ্র গল্পটি যেন বিলাসীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। শরৎ তাঁর অধিকাংশ কাহিনীর মধ্যেই নারীর চিরন্তন মহিমা বিধৃত করেছেন। স্বজনহীন, নিভৃতচারী মৃত্যুঞ্জয় হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ। অসহায়, অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের সেবার জন্য তাঁর একমাত্র খুড়া অথবা সমাজের কেউই এগিয়ে আসেনি। নিু বর্ণের সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে একান্ত সেবা শুশ্রুষা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে সুস্থ করে তোলে।

এ গল্পের মধ্যে লেখক হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার নিষ্ঠুর আচরণের দিকটি তুলে ধরেছেন।

দেশ, কাল, পাত্র, সমাজ সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে মানুষের হৃদয়ের সুন্দরতম প্রকাশ যে ভালোবাসার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার আবেদন এ গল্পের মূল বিষয়।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে পারবেন।
- পল্লী গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মূল পাঠ
ক্রোশ – এক ক্রোশ দুই মাইলের সমান। **মা-স্বরস্বতী** – বিদ্যার দেবী (হিন্দু শাস্ত্রে স্বরস্বতীকে বিদ্যার দেবী হিসাবে আরাধনা করা হয়। **কৃতবিদ্য** – সুশিক্ষিত, বিদ্বান, **রম্ভা** – কলা।	পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই। আমি একা নই-দশ বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদের ছেলেদের শতকরা আশিজনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে, তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এ কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতের চারক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়- চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি- বর্ষার দিনে মাথার ওপর মেঘের জল পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগা বালকদের মা-স্বরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না। তারপরে এ কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান-তাঁদের চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর দুর্দশা হয় না। ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ঐ চারক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। স্কুলে যাই-দুক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন বনে বঁইচি ফল অপর্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এ পাকিল বলিয়া, কার মর্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুরমেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এ সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসলে যা বিদ্যা-কামস্কাটকার রাজধানীর নাম

টীকা

তারপর একদিন ছেলেপুলের পড়া ও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না। – সমাজের স্বচ্ছল অভিভাবকগণ লেখা-পড়ার প্রতি সব সময়ই সজাগ থাকেন। বিদ্যালয়ের দূরত্ব ও পথ দুর্গম হওয়ার কারণে বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করা কষ্টকর। তাছাড়া, দীর্ঘ পথ যাত্রায়

ক্লান্ত শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজনীয় পাঠাভ্যাস করা সম্ভব হয় না। ফলে, অনিয়মিত পাঠ্যাভ্যাসের কারণে পড়ালেখার প্রকৃত মান অর্জনে শিক্ষার্থীগণ সাফল্য লাভ করে না। সন্তানের লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহী ও ভবিষ্যত চিন্তায় উদগ্রিব অভিভাবকগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতেন। শহরের সুযোগ-সুবিধা ও স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত অভিভাবক ও সন্তান-সন্ততিগণ পুনরায় গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন না। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামো সৃষ্টির অভাবে গ্রাম বাংলার এ করুণ চিত্র যেন চিরকালের।	কি, এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে-এ সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলে না। কাজেই এক্‌জামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারশিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ। এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ের ধারণা প্রায় এক রকমই আছে- তারপরে প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেয়াই কর্তব্য।

সার-সংক্ষেপ

পল্লীগ্রামের বিদ্যার্থীদের শিক্ষার সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। শতকরা প্রায় আশি জন শিক্ষার্থীকে জীবনে এ দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য একটি গ্রাম থেকে দূরবর্তী অবস্থানের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য শিক্ষার্থীর অধিকাংশ শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে, বিদ্যাভাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় শ্রমক্লান্ত অবসন্ন শরীর প্রদান করতে পারে না। কিশোর বয়সের শিক্ষার্থীর নিকট বিদ্যালয়ে যাত্রাপথের দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা নানান ধরনের আকর্ষণের উপকরণ এত বেশি প্রলুব্ধ করে যে, শিক্ষা লাভের জন্য আবশ্যক তথ্যগুলি বড় বেশি অনাবশ্যক বলে মনে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. লেখকের বিদ্যালয় ত্যাগ করা কর্তব্য বলে মনে হয়েছে কেন?
২. "দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসতই মেলেনা" কোন প্রসঙ্গে লেখক এ কথা বলেছেন?
৩. "দুর্ভাগা বালকদের" কথাটি কাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।
৪. "ধূলার সাগর সাঁতার" শব্দ সহযোগে একটি সুন্দর বাক্য লিখুন।

৫. "তারপর একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।" বাক্যটি চলতি ভাষায় রূপান্তর করুন।

লেখক পল্লীগ্রামের লেখাপড়ার কী কী অসুবিধার কথা বলেছেন?

উত্তর : গ্রামে প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম। ফলে, শিক্ষার্থীদের দূরবর্তী স্থানের বিদ্যালয়ে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়। এ দূরত্ব সাধারণত ৪/৫ মাইলের কম হয় না। প্রতিনিয়ত হাঁটা পথে চলাচলের জন্য শ্রম-ক্লান্ত শিক্ষার্থী লেখাপড়ার প্রতি যথেষ্ট মনযোগ প্রদান করতে পারে না। পল্লী রাস্তাঘাট বর্ষা-গ্রীষ্ম সব সময়ই দুর্গম। সেকালের পল্লী গ্রাম ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল অত্যন্ত বেশি। ফলে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কোনো না কোনো সময় এ রোগের শিকারে পরিণত হত। দূরবর্তী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথের দুপাশে ধরে থাকা নানা প্রকার ফলের প্রতি এ বয়সের কিশোরদের আকর্ষণ থাকে বেশি। পড়ার বিষয়বস্তু মনে রাখার চেয়ে কবে কোন ফলটি খাওয়ার উপযোগী হবে সেই বিষয়াদির আকর্ষণ কিশোর মনের নিকট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বালক বয়সে লেখাপড়ার প্রতি অমনোযোগের এ বোঝা পরিণত বয়সেও বহন করে চলতে হয়।

পল্লী গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা আলোচ্য অংশে কিভাবে প্রদান করা হয়েছে?

উত্তর : বর্ষার দিনে অবিরাম বৃষ্টির কারণে পথ-ঘাট কর্দমাক্ত হয়ে যায়। পিচ্ছিল, দুর্গম রাস্তাঘাট পায়ে চলার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। গ্রীষ্মের দিনে অসহনীয় গরম ও প্রখর সূর্যতাপ। তাপদগ্ধ পথে হাঁটাচলা করা ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতা।

লেখক এ বর্ণনার পাশাপাশি বাংলার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের রূপটিও তুলে ধরেছেন। ঝোপঝাড়ের মধ্যে রসাল আনারস, আম, কাঁঠাল, বইচি, কলা ও খেজুর ফলের অপরিমিত সমাহারের বর্ণনা এ অংশে বর্ণিত হয়েছে।

সাধুরীতি থেকে চল্‌তি গদ্যে রূপান্তর করুন : 'চার ক্রোশ পথ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই ছেলেপুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান, তাহার আর সংখ্যা নাই।"

উত্তর॥ চারক্রোশ পথ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই ছেলেপুলে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরে পালান, তার আর সংখ্যা নেই।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাথমিক পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- সেবাপরায়ণা বিলাসীর চরিত্রের বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রামের মানুষের সাধারণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
থার্ড ক্লাস – ৮ম শ্রেণী। যম – মৃত্যুর অধিদেবতা। **সদ্ব্যয়** – সৎভাবে ব্যয়। **তক্তপোষ** – খাট।	আমাদের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝেই স্কুলের পথে দেখা হইত। তাহার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে সে যে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এই খবর আমরা কেহই জানিতাম না-সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়-আমরা কিন্তু তাহার ঐ থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি।

শিয়রে – মাথার নিকটে।

অচৈতন্য – অজ্ঞান।

প্রদীপ – বাতি, আলো।

বাটীতে – বাড়িতে।

সহমরণে – একত্রে বা এক সংগে মরণ।

প্রকৃতিস্থ – স্বাভাবিক অবস্থা।

জ্যান্ত – জীবন্ত।

অভিপ্রায় – ইচ্ছা।

প্রত্নতাত্ত্বিক – প্রাচীন বা পুরাতন বিদ্যায় পারদর্শী

জনশ্রুতি – লোকে বলে এমন।

দণ্ড – শাস্তি।

যমরাজ – মৃত্যু দেবতা।

তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেন্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা, ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা- সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ, নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়–উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভাল করিয়াই চলিত। যেই দিন দেখা হইয়াছে, সেইদিনই দেখিয়াছি ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের এক ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই-বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এ যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে, এই কথাও কোন বাপ ভদ্র সমাজে কবুল করিতে চাহিত না- গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেক দিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল সে মর-মর। আর একদিন শোনা গেল, মালপাড়ার এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এই যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি-মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়োবাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বাচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তপোষের ওপর পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিক যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ঐ মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, বসো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটি কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম এ যে, প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এ কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এ বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কত বড় গুরুভার। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রুষা, কত ধৈর্য, কত রাতজাগা। সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এ অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্যন্ত তোমার রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং মনে যাই থাক, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন জঙ্গলের পথ, একটু দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম, উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এ বনের পথ পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতেই বোধ করি তাহার শেষ পর্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম না। এ দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় ত যে-কোন মুহূর্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এ বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত। কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত।

এ প্রসঙ্গের অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি-বাটীতে ছেলেপুলে, চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সদ্য-বিধবা স্ত্রী আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা! কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন

সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এ রাত্রেই গ্রামের পাঁচজন যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় তা পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমনি কত কি। কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেয়া চাই-অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, "ভাই, যা হবার সে ত হইয়াছে, আর বাইরে গিয়া কি হইবে? রাতটা কাটুক না"

বলিলাম "অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।"

তিনি বলিলেন, "হোক কাজ, তুমি বসো।"

বলিলাম, "বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে", বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে বাপরে। আমি একলা থাকতে পারব না।"

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ, তখন বুঝিলাম, যে স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি-বা সহে তাঁর মৃতদেহটা এ অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না। বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এ মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাহার তুচ্ছ করিয়া একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার উল্লেখ না করিয়াও আমি এ কথা বলিতে চাই যে শুধু কর্তব্যজ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর করার অধিকারেই এ ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহুস্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সে শক্তির পরিচয় যখন কোন নরনারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেয়ার আবশ্যক যদি হয় ত হোক, কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নহে, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন না করিয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাঁহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা? এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে যে, অতবড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার খবরই নাই। তাহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এ-ই হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াশুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এ যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কিনা, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

সার-সংক্ষেপ

মৃত্যুঞ্জয় লেখকের একই গ্রামের ছেলে। নিরীহ, পরিজনহীন মৃত্যুঞ্জয় গ্রামের প্রান্তে একটি বিশাল পোড়ো বাড়িতে একাকী বসবাস করত। বাড়ি সংলগ্ন প্রকাণ্ড আম কাঁঠালের বাগান থেকে প্রতি বৎসর বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মৃত্যুঞ্জয়ের ভালোভাবেই চলত। এ বাগানটির প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের একমাত্র দূর সম্পর্কের খুড়া একজন ভাগীদার বলে সকলের নিকট বলে বেড়াত। কিন্তু এ দাবীর প্রতি সত্যনিষ্ঠ কোনো প্রমাণ না থাকায় মৃত্যুঞ্জয়ের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটেছে বলে শোনা যায়নি।

মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাস অর্থাৎ ৮ম শ্রেণীর ছাত্র হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু এ ক্লাসের ছাত্র হিসাবে কত দিন ধরে অধ্যয়ন করে আসছে সে ইতিহাস অনেকেরই অজানা। স্বল্পভাষী মৃত্যুঞ্জয় প্রতিদিন জীর্ণ মলিন পুস্তক বগলে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করত। কারো সংগে সে নিজে থেকে আলাপ না করলেও অনেকেই উপযাচক হয়ে আলাপ করতে উৎসাহী ছিল। কারণ, অন্যকে খাওয়ানো এবং গোপনে অর্থ সাহায্য করতে মৃত্যুঞ্জয়ের কার্পণ্য ছিল না। কিন্তু এহেন পরোপকারী, নিরহংকার মানুষটির প্রতি গ্রামবাসী যে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ ছিল তা নয়।

দীর্ঘদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা না পেয়ে লেখক খোঁজ খবর নিতে গিয়ে লোকমুখে তার অসুস্থতার সংবাদ জানতে পারেন। একদিন লোক চক্ষুর অন্তরালে সন্ধ্যার অন্ধকারে লেখক তাকে দেখতে যান। মরণব্যাধির সংগে দীর্ঘ সংগ্রামের পর বেঁচে ওঠা, জীর্ণ কংকালসার শরীর দেখে লেখক বুঝতে পারেন, অপরিমেয় সেবা ও যত্নে এ যাত্রায় মৃত্যুঞ্জয় রক্ষা পেয়েছে। দিবারাত্র অনলস সেবা ও অবিরাম রাত্রি জাগরণের ছাপ নিয়ে রোগীর শয্যাপাশে দাঁড়ানো নারীই যে দরিদ্র সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী একথা লেখক বুঝতে পারেন। সেবা, শুশ্রুষা, মমতা ও হৃদয়ের অপরিমিত প্রাণশক্তি নিয়ে পাশে না দাঁড়ালে এমন রোগীকে বাঁচানো দুঃসাধ্য। অসম গোত্রের এক নারী সমাজের সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা দিয়ে সুস্থ করে তোলার এমন উদাহরণ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অথচ মৃত্যুঞ্জয়ের নিত্য সাহায্য প্রাপ্ত কোনো গ্রামবাসী তার রোগশয্যা পার্শ্বে এ সময়ে উঁকি মেরে দেখে নাই। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি পল্লীগ্রামের মানুষের বিপদে আপদে ঔদাসীন্যের পরিচয় লেখক আলোচ্য অংশে অত্যন্ত তির্যক ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২. মৃত্যুঞ্জয়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয় তার সম্পর্কে কী বলে বেড়াত?
৩. লেখক অসুস্থ মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে কী পরিবেশ দেখেছিলেন?
৪. অন্ধকার রাতে রোগী দেখে ফিরে যাওয়ার পথে লেখকের কী মনে হয়েছিল?
৫. মৃত্যুঞ্জয়ের আয়ের উৎস কী ছিল?
৬. সেবাপরায়ণা বিলাসী চরিত্রের বর্ণনা লিখুন।
৭. নরনারী কোন শক্তির জোরে সমাজের সকল ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে?

উত্তর

১. মৃত্যুঞ্জয় স্বভাবে নিরীহ, নির্বিরোধ ও পরোপকারী। নিজ বাগান সংলগ্ন জীর্ণ গৃহে দিন যাপনে সে অভ্যস্ত। দীর্ঘ দিন ৮ম শ্রেণীতে সে অধ্যয়ন করে আসছে। স্বল্পভাষী মৃত্যুঞ্জয় কারো সংগে কথা বলতে অভ্যস্ত নয়। সে সহপাঠীদের খাওয়ার আব্দার সহজেই মেটায় এবং সাহায্যপ্রার্থী কোনো প্রতিবেশীকে কখনও বিমুখ করে না।

৩. জীর্ণ গৃহের পরিষ্কার ঝকঝকে বিছানায় কংকালসার দেহে মৃত্যুঞ্জয় শয্যাশায়ী। পাশে দাঁড়িয়ে বিলাসী পাখা হাতে রোগীর গায়ে বাতাস প্রদানে ব্যস্ত। সেবারত বিলাসীর বয়স অনুমান করা শক্ত। রাত্রি জাগরণ ও অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত, অবসন্ন বিলাসীকে দেখে লেখকের বাসী ফুলের মত নিষ্প্রভ মনে হয়েছে।

৭. সমাজ, সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক সকল প্রতিরোধকে হৃদয়ের অনাবিল ভালোবাসা দিয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করা যায়।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক) ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসী ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

খ) ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধান পায় না।

ব্যাখ্যার উত্তর

আলোচ্য অংশটি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্প থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। লেখক প্রসঙ্গক্রমে বলছেন যে, নরনারীর পরস্পরের প্রতি আস্থা ও নির্ভরশীলতা নানাবিধ কার্যকারণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ভিত্তির স্থানটি দুর্বল হলে বিপদের সময় তাকে মোকাবেলা করার মতো শক্তির অভাব হয়। মানুষের হৃদয়ের নিবিড় ভালোবাসার গভীর শক্তি যে কোনো সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে সাহায্য করে।

চলিত ভাষায় রূপান্তর করুন

ক) মৃত্যুঞ্জয় নিজে রাঁধিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া পরা চলিত এবং ভাল করিয়াই চলিত।

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার চিত্রটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সবলের উপরে দুর্বলের অত্যাচারের বিবরণ প্রদান করতে পারবেন।
- সুবিধাভোগীর শ্রেণী চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অসহায় ক্লিষ্ট মানুষের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
অকালকুষ্মাণ্ড – অপদার্থ। **কালি** – আধুনিক কাল অর্থে। **বদনদগ্ধ** – লজ্জায় মুখ দেখাতে না পারা অর্থে।	এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল। নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার যো রহিল না- অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ে মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়,

সম্ভাষণ – সম্বোধন।

ম্লেচ্ছদেশে – অনার্য, অস্পৃশ্যদের দেশ।

তিলার্ধ – বিন্দুমাত্র, সামান্যমাত্র।

বারওয়ারী – সমবেতভাবে যে অনুষ্ঠান বা উৎসব করা হয়।

দক্ষিণা – ব্রাহ্মণকে ভোজন করানোর পর প্রদত্ত অর্থ।

ফলাহার – ফল-ভোজন, নিরামিষ দ্রব্য দ্বারা ভোজন বা আহার।

তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইতেছে। গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ একথা শুনিলে যে-ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা-অ্যাঁ এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল।

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে, তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো। তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুন সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ যে মিত্তির বংশের নাম ডুবিয়া যায়। গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এজন্য।

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের ওপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়ো ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোন খুড়া কোন কালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকা দিয়াছে জানো?

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি এবং সঙ্গে দশ-বারোজন বীরদর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে এত বড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষু লজ্জা হইবে।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নরনারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপর একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবুরা, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে-রোগা মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।"

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা, আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল। সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা থাক।

আপনারা মনে করিবেন না; পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড় লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।

এ মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জনীয় অপরাধ করিত তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা-এতো একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া। হোক না সে আড়াই মাসের রোগী, হোক না সে শয্যাশায়ী। কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়। ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ। সে ত আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে পল্লীগায়ের লোক সংকীর্ণচিত্ত নয়। চার ক্রোশ হাঁটা বিদ্যা যেসব ছেলের পেটে, তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়। দেবী বীণাপাণির বরে সংকীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া।

এ ত ইহারই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধু মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এ ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা, অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে। যাই হোক, ছোটবাবু তাহার স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রামের বারোয়ারী পূজা বাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি, পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণে নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এ দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেরই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

সার-সংক্ষেপে

মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়ের সংবাদ এবং বিলাসীর হাতে ভাত খাওয়ার অপরাধে খুড়া সকল গ্রামবাসীকে জড়ো করে এরূপ সামাজিক অনাচার ও গর্হিত কাজের জন্য বিচার জানায়। মিত্র বংশের এত বড় সুনাম যে ব্যক্তি ধূলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা অত্যন্ত জরুরী। গ্রামের অনেকে সোৎসাহে বিলাসীকে নির্দয় প্রহারে জর্জরিত করে তোলে। মৃত্যুঞ্জয়ের অপরাধ অমার্জনীয়, সে অন্নপাপী। নিরীহ, সেবা ক্লান্ত, দরিদ্র অসহায় বিলাসী রোগাক্রান্ত স্বজনহীন মৃত্যুঞ্জয়কে অক্লান্ত পরিশ্রমে সুস্থ করে তোলার মধ্যে যে অপরাধ থাকতে পারে সে কথাটি তার কখনো মনে হয়নি। দুর্বল নারীর ওপর প্রবলের এ অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করার ও কোন স্থান মৃত্যুঞ্জয় পায়নি। সমাজচ্যুত মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আপন অধিকার সমর্পণ করেই তো জীবন-যাপন করছিল। নির্দয় নিষ্ঠুর সমাজপতি ও পল্লীবাসীর নিকট মানবিক মূল্যবোধের সৌজন্য, স্বীকৃতি ও সহানুভূতির কোনো মূল্যই এ দুটি নর-নারীর কপালে জোটে নাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। -এ কথাটি কে কোন প্রসঙ্গে বলেছে- সে সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখুন।
২. বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহের সংবাদে গ্রামবাসীর আচরণের বিবরণ দিন।
৩. "ভাত খাওয়া যে অন্নপাপ"- প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে লিখুন।
৪. হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখকের মতামতগুলি নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর

প্রশ্ন : "ভাত খাওয়া যে অন্নপাপ"- প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে লিখুন।

উত্তর : পরম যত্ন, সেবা ও কৃচ্ছতার দ্বারা বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়কে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলে। শুধু কৃতজ্ঞতার বশেই নয় হৃদয়ের টানেও মৃত্যুঞ্জয় বিলাসীকে বিবাহ করে। সেবা, কৃতজ্ঞতা ও হৃদয়ধর্মের টানে মৃত্যুঞ্জয় জাত্যাভিমান ভুলে গিয়ে একান্ত মানবিক আচরণের পরিচয় প্রদান করেছে। কিন্তু অনুদার, জাত্যাভিমান ভারাক্রান্ত হিন্দু সমাজ এ অসম বিবাহ মেনে নিতে চায় না। কারণ, নীচ জাতের হাতে ভাত খাওয়া অন্নপাপ। মৃত্যুঞ্জয় অন্নপাপী ক্ষমার অযোগ্য মহাপাতক। ক্ষমাহীন সমাজের কাছে সে ঘোর পাপী। সমাজ তাকে ধর্মচ্যুত করে। হিন্দু শাস্ত্রে অন্নপাপীর জন্য কঠিন বিধান নির্দিষ্ট করা আছে। ন্যাড়া রূপী শরৎচন্দ্র সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এ ব্যঙ্গোক্তি করেছেন।

প্রশ্ন : হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে লেখকের মতামতগুলি নিজের ভাষায় লিখুন।

উত্তর : আলোচ্য পাঠে শরৎচন্দ্র নির্দয়, লোভী, নিষ্ঠুর, সমাজপতিদের আচরণের নিন্দা করেছেন। অকৃতজ্ঞ সমাজ মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ থেকে গোপনে সাহায্য গ্রহণ করেছে অথচ তার বিপদের দিনে কেউ পাশে এসে দাঁড়ায়নি। প্রতিবেশী নিম্নবর্ণের সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী সেবা শুশ্রুষা দিয়ে যে মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুললো- তার মানবিক মহত্ত্বের গুণটি সমাজ উপেক্ষা করে জাতপাতের অজুহাতে নির্দয়ভাবে মানুষের আহাজারি উচ্চবর্ণের সবল সমাজপতি কখনও মানবিক

মূল্যবোধ দিয়ে বিচার করে না। স্বদেশের, সমাজের ও ধর্মের নামে পল্লীগ্রামের অমানবিক, নিষ্ঠুর আচরণের কথা অত্যন্ত তির্যক ও বাস্তব সম্মত ভাবে লেখক এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

☞	যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

ক) আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্যন্ত খাইয়াছে।
খ) যাহারই গায়ে জোরে নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।
গ) বরঞ্চ বড় লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক হইয়া যাইবেন।
ঘ) এখন শুধু ইংরাজকে কষিয়া গালি-গালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

উত্তর

ক. আলোচ্য অংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিলাসী" শীর্ষক গল্প থেকে নেয়া হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের জ্ঞাতি খুড়া মিত্র বংশের অধঃপতনের অনাচারে লিপ্ত ভাইপোর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উপরোক্ত মন্তব্য করে।
উচ্চ বর্ণের মিত্র বংশ না হয় ছোটজাতের মেয়েকে বিয়ে করেছে - তাও সহ্য করা যায়; কিন্তু অমন ছোটজাতের হাতে ভাত খাওয়া তো মহাপাপ। বিলাসীর প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের হৃদয়ের মানবিক আবেদনটুকু জাতপাতের কাছে অনেক তুচ্ছ ব্যাপার। সমাজ সংসারের অধিকর্তাদের নিকট মৃত্যুঞ্জয় অন্নপাপী মহাপাতক। ছোটজাতের হাতে অন্নগ্রহণ শাস্ত্রমতে মহাপাপ। হিন্দু সংস্কারে অন্যজাতের ছোঁয়া ভাত খাওয়া নিষেধ। প্রচলিত সংস্কার বিরোধী কাজের শাস্তি স্বরূপ সমাজের শোকে অসহায় দুর্বল নারী বিলাসীকে শারীরিক ভাবেই নির্যাতন করে ক্ষান্ত হয়নি- মৃত্যুঞ্জয়কে পর্যন্ত সমাজচ্যুত করে ছেড়েছে।

খ. উদ্ধৃতাংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখক আলোচ্য অংশে গ্রাম শুদ্ধ লোকে জাতপাতের কথা তুলে অসহায়, দরিদ্র দুর্বল নারী বিলাসীকে প্রহারের কারণে এ মন্তব্য করেছেন।
গ্রামে যার লোকবল নেই, যে দরিদ্র, অসহায় এবং সমাজের নিম্নস্তরে যার অবস্থান, সমাজপতিরা তাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণেও অত্যাচার করে থাকে। পল্লী সমাজের সবল যে, শাস্ত্রীয় বিধান তার পক্ষেই কার্যকর হয়। সমাজপতিরা ধর্মের নামে, সংস্কারের নামে অসহায় মানুষের হৃদয়ের বিধানকে কোন প্রকার মূল্য প্রদান করে না। দুর্বলকে পরাস্ত করা সহজ, নিপীড়ন করাও তেমনি কঠিন নয়। প্রতিবাদ করা ও প্রতিকার চাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। ফলে, অসহায় মানুষ সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক অত্যাচারের খড়্গ তার ওপরে অনায়াসেই নেমে আসে।

ভাষারীতি পরিবর্তন করুন

তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন, কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের করুণ পরিণতির বর্ণনা করতে পারবেন।
- মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

- ভালোবাসার শক্তি যে সকল প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন থেকে প্রাপ্ত ঘটনার আলোকে তার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমাজে প্রচলিত অমানবিক আচরণের চিত্র অংকন করতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
এন্ট্রান্স – এস.এস.সি পাশের সমতুল্য। **মনসা** – সাপের দেবী। **সাগরেদ** – শিষ্য। **পিন্ডি** – পরলোকগত পিতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত অন্ন। **প্রায়শ্চিত্ত** – চিত্তের বিশুদ্ধতা সাধন।	বৎসর-খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। একদম দুপুর বেলা ক্রোশ-দুই দূরের মালপাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি, একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তাহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি-চুল গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা-কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়। কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যে জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গিয়াছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ -পুরুষের জাতটা বিসর্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিত পারে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরানী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্যব্রাহ্মণের ছেলেকে এন্ট্রাস পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভাল কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে-তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোন কালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল। কিন্তু সকলেই ওই একই হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নিজের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না? কিন্তু থাক। ঝোঁকের মাথায়, হয়ত বা অনধিকার চর্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুশকিল হইয়াছে এ যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বইজন নরনারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এ সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারি খুশি হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, "তুমি না আগলালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্য না জানি কত মার তুমি খেয়েছিলে।" কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা ওখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে একথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম। তাই শুনিলাম আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলেবেলা হইতেই দুটা জিনিসের ওপর আমার প্রবল শখ ছিল। এক ছিল গোখ্‌রো সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র--সিদ্ধ হওয়া। সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ

লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শ্বশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন প্রসন্ন হইয়া উঠিবে তাহা কে ভাবিতে পারিত?

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাস খানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্টা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে-

-ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন-

মনসা দেবী আমার মা-

ওলটপালট পাতাল-ফোঁড়-

ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে-

-দুধরাজ, মণিরাজ।

কার আজ্ঞা-বিষহরির আজ্ঞা।

ইহার মানে যে, কী তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন-নিশ্চয় কেহ না কেহ ছিলেন-তাঁর সাক্ষাৎ কখনও পাই নাই।

অবশেষে এদিন এ মন্ত্রের সত্য মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপধরার জন্য চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এতটুকু বয়সের মধ্যে এত বড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি যো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে ত ভাল মন্দ কোনো কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এসব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়াচাড়া করো। বস্তুত বিষদাঁত ভাঙা, সাপের মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলো এমনি অবহেলার সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সেসব মনে পড়িলে আমার আজও গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এ যে, সাপধরাও কঠিন নয় এবং ধরাসাপ দুই চারিদিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রি করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পালাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তারপর তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক বা একটা কাঠিই দেখান হোক, সে কোথায় পালাইবে তা ভাবিয়া পায় না। এ কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করে মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে-এতে দোষ কি?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছামিছি লোক ঠকাইতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বার বার লক্ষ্য করিয়াছি। সাপ ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানাপ্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিত-আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে ত একেবারেই ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত এক রকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানাপ্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুত ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এ পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে-ঘরের মঝে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে-সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয় এক-জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশি থাকিতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেছে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখছ না বাসা করেছিল?

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে।

বিলাসী কহিল দু-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলছি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড খরিস গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্‌টা পিঠ দিয়ে ঝর ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পালাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত হইতে একহাত বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এ একটিবার দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চিৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরেও আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার উর্ধ্বে আর উঠিবে না, বরং সেই "বিষহরির আজ্ঞা" মন্টা সতেজে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকে সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমিও বুঝিলাম বিষহরির দোহাই বুঝি বা আর খাটে না।

নিকটবর্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনও বা একসঙ্গে কখনও বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন ওঝা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে মৃত্যুঞ্জয় তো মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা ধ্বস্ত াধ্বস্তির পরে রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম তাহার শ্বশুরের দেয়া মন্দৌষধি সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনীটি আর বাড়াইল না। কেবল এটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনও করো না।

আমার মাদুলি-কবচ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নহে এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয় নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখনই যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোনো একটা নরকে যাওয়ার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এমাত্র বলিতে পারি।

খুড়া মশাই ষোলআনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের ন্যায় চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাত-মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষ মানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে যায় না-না হয় একটু নিন্দাই হত। কিন্তু হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে মলো, আমার পর্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে এক ফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হল একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্নপাপ। বাপ রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে।

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটা অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায় ভাবি, এ অপরাধ হয়ত ইহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ। তবু অত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নরনারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নরনারী আশা করিবার সৌভাগ্য, আকাঙক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব, পরাজয়ের ব্যথা কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব প্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক document তা সে যতই কেননা

বৈদিক মন্ত্র দিয়া Contract পাকা করা হোক, সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী-অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সেই গৌরবের কণামাত্র হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহাদের হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নহে, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এ বস্তুটাই এ দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি ভূদেব বাবুর পারিবারিক প্রবন্ধেরও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও নিন্দা করিব না। করিলেও মুখের ওপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এ হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধিব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিকিয়া থাকাই চরম সার্থকতা নয়, এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে। আমি শুধু এ বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্রির চোখে চোখে এবং কোলে কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু-এক পা হাঁটিতে দিলেই প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

সার-সংক্ষেপ

দীর্ঘ দিন যাবৎ ন্যাড়ারূপী শরৎচন্দ্রের মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীদের সংগে কোনো প্রকার যোগাযোগ ছিল না। শরৎচন্দ্র সন্ন্যাস জীবন থেকে অব্যাহতি নিয়ে নিজগ্রামে চলে আসেন। এ সময়ে তিনি নতুন করে আবার বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়ের জীবনের সংগে জড়িয়ে পড়েন।

মৃত্যুঞ্জয় লেখা পড়ায় ইস্তফা দিয়ে বিলাসীর সংগে দাম্পত্য জীবন যাপন করছে। নিজ জাত ধর্ম ত্যাগ করে বিলাসীর পিতৃ পেশা গ্রহণ করে মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ে হিসাবে এখন পরিচিত। সাপ ধরাই এখন তার একমাত্র পেশা। বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের এ নতুন পেশা গ্রহণের জন্য সব সময়ই উৎকণ্ঠিত থাকে। নানাভাবে সে স্বামীকে এ পেশা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় নারাজ। বিলাসী মৃত্যুঞ্জয়ের এ কাজে সব সময় সাথে সাথে থাকে। স্বামীর মঙ্গলের জন্য তার সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে।

ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মহা উৎসাহে সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত। মৃত্যুঞ্জয়ের পেশা সংক্রান্ত সকল কাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী সে। বিলাসী ন্যাড়া ও মৃত্যুঞ্জয়কে এ পেশা ত্যাগ করার জন্য বহুভাবে অনুরোধ জানিয়ে ও ফেরাতে ব্যর্থ হয়। এমন একটি দুঃসাহসিক ও উত্তেজনাময় কাজের জন্য ন্যাড়া দারুন খুশী হয়। অবশেষে, একদিন সাপ ধরতে যেয়েই মৃত্যুঞ্জয় মারা যায়। ওঝা, বৈদ্যের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে।

বিলাসী জীবনের সকল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও একনিষ্ঠ ভালোবাসার বিনিময়ে যে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছিল- তার পক্ষে মৃত্যুঞ্জয় বিহীন জীবন যাপন করা আর সম্ভব ছিল না। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি একনিষ্ঠতা, প্রেমের প্রতি অবিচ্ছেদ্য অনাবিল আনুগত্য মহৎপ্রাণ বিলাসীর -- সহ্য করা সম্ভব ছিলনা। ছোটজাত, নিম্নবর্ণের বিলাসীর মহৎপ্রেমের এ একনিষ্ঠতা প্রকাশ পাঠক মনকেও ভারাক্রান্ত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ''টিকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয় এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে।'' - কে এবং কোন প্রসঙ্গে এ উক্তি করা হয়েছে?

২. বিলাসীর আত্মহত্যা লেখক কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন?

৩. ''সে দেশের লোকের সাধ্যই নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে'' আলোচ্য মন্তব্যটি কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

৪. "যে পল্লী গ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি এটা শুধু তাহাদেরই?" বক্তব্যটির তাৎপর্য প্রসঙ্গপূর্বক আলোচনা করুন।

নমুনা উত্তর

২. বিলাসী হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ সাপুড়ের কন্যা। মৃত্যুঞ্জয় ভালোবেসে বিলাসীকে বিয়ে করে। মৃত্যুঞ্জয় কায়স্থ ঘরের সন্তান। হিন্দুধর্ম ও বর্ণ প্রথায় বিশ্বাসী সমাজ তাদের এ সামাজিক রীতি বিরুদ্ধ কাজ মেনে নিতে পারেনি। মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট প্রেমের মূল্য সামাজিক প্রথা ও রীতির চেয়ে অনেক বেশি; তাই সে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে সব কিছু ত্যাগ করে হৃদয়ের মূল্যকেই অনেক বেশি বড় করে দেখেছে। এমনকি, মৃত্যুঞ্জয় সমাজ, ধর্ম ত্যাগ করে পেশা হিসাবে সাপ ধরাকে পর্যন্ত গ্রহণ করেছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের এ পেশাই একদিন জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। সাপ ধরতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় সাপের কামড়ে মারা যায়। মৃত্যুঞ্জয়ের আকস্মিক মৃত্যুজনিত আঘাত সহ্য করতে না পেরে বিলাসী আত্মহত্যা করে। মৃত্যুঞ্জয়বিহীন বিচ্ছেদময় জীবন বিলাসীর পক্ষে সহ্য করা কঠিন, একনিষ্ঠ ভালোবাসার পাত্র ছাড়া বিলাসীর জীবন শূন্য হয়ে পড়ে। এ শূন্য জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিলাসী অবশেষে আত্মহত্যা করে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে আত্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু লেখকের দৃষ্টিতে বিলাসীর আত্মহত্যা একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমায় উজ্জ্বল।

৩. সমাজে কীর্তিমান পুরুষদের যে মহিমা নিরন্তর উচ্চারিত হয় তার সবটুকু কৃতিত্ব কি পুরুষেরই? লেখকের নিকট প্রশ্ন এ যে, একজন পুরুষের উচ্চাসনে বসার জন্য সমাজ যে, গুণকীর্তন করে তার পশ্চাতে যে, একজন নারীর অপরিসীম নিষ্ঠা, শ্রম ও প্রেরণার অবদান আছে তা কি আমরা মূল্যায়ন করি? পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর এ অবমূল্যায়ন লেখকের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্যে নারীর অনেক মহত্ত্ব, ত্যাগ ও মহিমাময় জীবনের আলেখ্য রচনা করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়ে ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়া চাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।"

২. অবশ্য দখল তিনি একদিন পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে জেলা আদালতে নালিশ করিয়া নয়, উপরের আদালতের হুকুম।

৩. আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাতে যাই।
৪. স্বদেশের মঙ্গলের জন্য অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১. বিলাসীর চরিত্র অংকন করুন।
২. এ গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন হিন্দু সমাজের পরিচয় প্রদান করুন।
৩. মৃত্যুঞ্জয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।
৪. বিলাসী গল্পের সারমর্ম নিজের ভাষায় লিখুন।
৫. "বিলাসী শুধু সেকালের নারী সমাজের নয়" মনে হয় যেন একালের নারী সমাজেরও একজন প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্র, আলোচনা করুন।

উত্তর

১. শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য কর্মে নারীর সত্যনিষ্ঠ মর্যাদা ও মানবিক মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। বিলাসী হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ। কিন্তু, তাঁর হৃদয়ে যে সেবাপরায়ণা, পরোপকারী, প্রেমময়ী ও সত্যনিষ্ঠ নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সংগে তুলে ধরেছেন।

বিলাসী একনিষ্ঠ প্রেমময়ী নারী। বিলাসী প্রেমের নিভৃত প্রকাশ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে জয় করার যে প্রচেষ্টা তার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে। মৃত্যুপথ যাত্রী মৃত্যুঞ্জয়কে নিয়ে রাতের পর রাত দিনের পর দিন একাকিনী অন্ধকারাচ্ছন্ন পোড়ো বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পেরেছে- তা শুধু সম্ভব হয়েছে ভালোবাসার জন্যেই। গ্রামবাসী সম্মিলিত ভাবে তাকে যখন পীড়ন করেছে, প্রহার করেছে, , লাঞ্ছিত করেছে তখন এ ভালোবাসার জোরেই সে সবাইকে উচ্চস্বরে মৃত্যুঞ্জয়ের সংগে তার বিয়ের কথা বলতে পেরেছে। বিলাসীর হৃদয় ছিল প্রেমের ব্যাকুল প্রকাশে উদ্বেগাকুল। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিটি মুহূর্তের ভালো মন্দ নিয়ে সব সময় উৎকণ্ঠিত। মৃত্যুঞ্জয়কে সে সাপ ধরার পেশা অবলম্বন করতে নিরুৎসাহিত করত। বিলাসী প্রেমের আনন্দময় গভীর সুখকে এ ঝুঁকি পূর্ণ পেশা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সংশয়াচ্ছন্ন করতে চায়নি। আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে বিলাসী তার প্রেমের পরম নিষ্ঠার পরিচয় আমাদের কাছে রেখে গেছে।

আবার মৃত্যুঞ্জয়ের রোগ শয্যাপার্শ্বে সেবাময়ী এত মহিমান্বিতা নারীর পরিচয় ফুটে উঠেছে বিলাসীর চরিত্রে। মমতাময়ী নারীর সেবাপরায়ণতা সব লোক লজ্জা, ভয়, শংকার ঊর্ধ্বে আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেবা ধর্মে উজ্জীবিত এক কল্যাণময়ী নারীর প্রতীক যেন বিলাসী। সেবার কল্যাণময় আদর্শে উজ্জীবিত নারীর এ চিরকালের রূপটি মৃত্যুঞ্জয়কে আকর্ষণ করেছিল।

বিলাসী অস্পৃশ্য ছোটজাতের মেয়ে। কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তায় সে সুস্থির। মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চবংশীয় খুড়া যখন, মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পত্তি অধিকার লাভে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, দুর্নাম রটায়, সেক্ষেত্রে বিলাসী লোক ঠকানো শিকড় বিক্রির জন্য মৃত্যুঞ্জয়কে নিষেধ করে। তার এ সততায় আমরা মুগ্ধ হই।

বিলাসী পতিগত প্রাণা। মৃতুঞ্জয়কে স্বামী হিসাবে পেয়ে সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করেছে। সমাজের নির্মম শাসনকে উপেক্ষা করে সে পিতৃদত্ত সকল ধন মৃত্যুঞ্জয়কে দান করেছে। স্বামী তার নিকট অনেক, সাধনা ও গৌরবের ধন। সাপ ধরার সময় সর্বক্ষণ সে মৃত্যুঞ্জয়ের পাশে থেকেছে। তার মঙ্গলের জন্য এ পেশা ত্যাগ করার জন্য বারবার অনুরোধ করেছে। অবশেষে এ পেশাই তার জীবনে দুর্ভোগের পরিণতি ডেকে এনেছে। মৃত স্বামীর অনুপস্থিতির দুঃসহ জ্বালা বিলাসী সহ্য করতে পারেনি। আত্মহত্যা করে সে জ্বালার সমাপ্তি ঘটিয়েছে। নিষ্ঠুর সমাজ বিলাসীকে উপহাস করলেও প্রেমময়ী, সাধ্বী, সেবাপরায়ণা, ব্যক্তিত্বময়ী নারী হিসাবে ম্লান হয়ে থাকবে।

সৃজনশীল কাজ

১. গল্পের যে যে অংশে শরৎচন্দ্র সমাজের প্রতি তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ করেছেন সেই অংশগুলি চিহ্নিত করে নিজের মত করে লিখুন।

২. আমাদের বর্তমান সমাজে নারীর অধিকারহীনতার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করুন।

৩. আপনার এলাকার একজন দুঃস্থ অধিকারহীন, নিগৃহীত নারীর জীবনের কাহিনী নিজের কথায় লিখুন।

৪. বিলাসী গল্পের মধ্যে কোনো বাক্য বা অংশ দুর্বোধ্য মনে হলে তা চিহ্নিত করুন। উক্ত অংশগুলো আপনার টিউটোরিয়াল ক্লাসের শিক্ষকের নিকট থেকে জেনে নিন। অথবা আপনার সহযোগী শিক্ষার্থীর সংগে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা করুন।

আরোও যা পড়তে পারেন

শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান গল্প ও উপন্যাসগুলো পড়ুন।

যৌবনের গান

কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাধা জীবনে কখনই তিনি আকৃষ্ট হননি। কৈশোরে কিছুকাল গ্রাম্য 'লেটো' গানের দলে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে কাউকে কিছু না বলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগদান করে করাচীতে চলে যান।

যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এক সময় তিনি পুরোপুরি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' প্রকাশিত হয়। নজরুলের কবিখ্যাতি তখন থেকেই বিস্তৃত হতে থাকে।

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত বিকাশ মূলত কবি হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খ্যাতি যখন মধ্যগগনে তখনই কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা পথে না চলে আপন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে নিজেকে বিকশিত করেছেন। সাহিত্যে এনেছেন সাম্যবাদ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। সেই সঙ্গে রাজনীতিকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক অত্যাচারী ইংরেজদের শাসন এবং শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অবিরাম চালনা করেছেন। মূলত কবি হিসেবে পরিচিত হলেও গদ্য সাহিত্য রচনায়ও তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পাদক এবং সমালোচক হিসেবেও নজরুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

নজরুলের উপন্যাসগুলোর পটভূমি গড়ে উঠেছে বিপ্লব ও সন্যাসবাদকে কেন্দ্র করে। দেশপ্রেম এবং নির্যাতিত মানুষের কথা উপন্যাসগুলোতে বাস্তব সম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

নজরুলের ছোটগল্প বেশিরভাগই প্রেমকেন্দ্রিক। তিনি মূলত যৌবনের কবি। যৌবনের ধর্মই হল একদিকে যেমন বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ, অন্যদিকে প্রেম। এ দুটো অনুভূতিরই সূচনা হয় আবেগের প্রাবল্য থেকে। নজরুলের ভাষণ, সম্পাদকীয়, সমালোচনা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রতিটি ক্ষেত্রই ভাষায় কাব্যিক ব্যঞ্জনা এবং বলিষ্ঠতায় পূর্ণ।

নজরুলের প্রধান রচনাসমূহ :

কাব্য : অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী(১৯২৪), সাম্যবাদী(১৯২৫), সর্বহারা(১৯২৬), ফণিমনসা(১৯২৯), ছায়ানট প্রভৃতি।

উপন্যাস : বাঁধনহারা(১৯২৭), কুহেলিকা(১৯৩১), মৃত্যুক্ষুধা(১৯৩০)।

গল্প : ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন(১৯৩২)

প্রবন্ধ : যুগবাণী(১৯২২), রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী ও রাজবন্দীর জবানবন্দী।

অনুবাদ : রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ, কাব্যে আমপারা।

সম্পাদনা : দৈনিক নবযুগ, ধুমকেতু, 'লাঙল' পত্রিকা।

নজরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করেন।
১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেলেও গদ্য রচনাতেও তিনি যোগ্যতার ছাপ রেখেছেন।

"যৌবনের গান' প্রবন্ধ হিসাবে সঙ্কলিত হয়েছে। তবে প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভাষণ। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ ও ৬ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর উদ্যোগে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সমাজের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম সভাপতি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন। এ অভিভাষণটি পরে দ্বিমাসিক সাম্যবাদী পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে 'যৌবনের গান' নামে প্রকাশিত হয়। নজরুল ইসলামের আবেগপূর্ণ ও উদ্দীপনার এ ভাষণে মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তোলার একটি প্রচেষ্টা আমরা লক্ষ করি।

ইউনিটের উদ্দেশ্য

১. কাজী নজরুল ইসলামের অসাধারণ, উদ্দীপনাময় ও আবেগপ্রবণ গদ্যরচনার পরিচিতি লাভ করবেন।
২. জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
৩. বক্তৃতার ভাষা সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কাজী নজরুল ইসলাম কেন গান করেন তা লিখতে পারবেন।
- নজরুল বক্তা এবং কবিদের বাণীর পার্থক্য কিভাবে করেছেন তা বলতে পারবেন।

☞	মূলপাঠটি নীরবে ও সরবে কয়েকবার পড়ুন এবং বুঝবার চেষ্টা করুন। বামদিকে কঠিন শব্দের অর্থ দেয়া আছে। সেগুলো জেনে নিন। একইভাবে অন্য পাঠগুলোও পড়ুন।

শব্দার্থ	মুলপাঠ
দ্বিধা – সংশয়, সংকোচ। **কর্মী** – যারা কাজ করে। **ধ্যানী** – যারা ধ্যান করেন। **সাধন** – শেষ করা। **মহৎ** – মহান। **রুধির ধারা** – রক্তের ধারা। **মমতারস** – মমতা হতে যে রসের সৃষ্টি। **অলক্ষ্যে** – দৃষ্টির অগোচরে।	আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন–ধ্যানী। যাঁহারা মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন সেবা দিয়া, ধর্ম দিয়া, তাঁহারা মহৎ, কিন্তু সেই মহৎ যদি না-ই হন, অন্তত ক্ষুদ্র নহেন। ইহারা থাকেন শক্তির পেছনে রুধির ধারার মতো গোপন, ফুলের মাঝে মাটির মমতা-রসের মতো অলক্ষ্যে। আমি কবি–বনের পাখির মতো স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাহি, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। বায়স ফিঙে যখন বেচারা গানের পাখিকে তাড়া করে, তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা আঘাত করে, তখনও সে এক গাছ হইতে উড়িয়া আন্ গাছে গিয়া গান ধরে। তাহার হাসিতে গান, তাহার কান্নায় গান!

বনের পাখী – বনে যে পাখি থাকে।

বায়স – কাক।

ফিঙে – এক ধরণের পাখি।

গানের পাখী – কোকিল।

চঞ্চু – ঠোঁট।

অলসতন্দ্রা – আলস্য থেকে যে ঘুমের আমেজ সৃষ্টি হয়।

দৈব – আকস্মিক।

পরিক্রমণ – চারিদিকে ঘোরা।

তারুণ্য – তরুণের বিশেষণ।

ভরাভাদর – ভাদ্রমাসের পরিপুর্ণ নদী।

জোয়ার – চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্র ও নদ-নদীর জল স্ফীতি।

অগোচরে – দৃষ্টির বাইরে, অজ্ঞাতে।

না-ওয়াকিফ – ওয়াকিবহাল নয়, জানেনা।

বক্তা – যিনি বক্তৃতা করেন।

কমবক্ত – হতভাগ্য। ফারসি শব্দ।

বক্তিয়ার খিলজী – ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিল্‌জী। বিশিষ্ট মুসলিম সেনানায়ক। কথিত আছে তিনি মাত্র ১৭জন অশ্বারোহীর সাহায্যে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবিজয় করেন।

দিগ্বিজয়ী – চারিদিক জয় করেছে যে।

বাক্যের সৈন্য-সামন্ত – এখানে বাক্যের সৈন্য সামন্ত বলতে শব্দ, ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

লক্ষ্মণসেন – ইনি বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা। বখতিয়ার খিলজীর অতর্কিত আক্রমণের সময় তিনি গোপনে পালিয়ে যান।

অবিরল – অনবরত, বিরামহীন।

ক্ষীণ – সরু, সংকীর্ণ।

পদ্মা – নদী।

খরস্রোতা – প্রবল স্রোত যার।

সে গান করে আপন মনের আনন্দে-যদি তাহাতে কাহারও অলস-তন্দ্রা, মোহ-নিদ্রা টুটিয়া যায়, তাহা একান্ত দৈব। যৌবনের সীমা পরিক্রমণ আজও আমার শেষ হয় নাই। কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান। তারুণ্যের ভরা-ভাদরে যদি আমার গান জোয়ার আনিয়া থাকে, তাহা আমার অগোচরে; যে চাঁদ সাগরে জোয়ার জাগায়, সে হয়ত তাহার শক্তি সম্বন্ধে আজও না-ওয়াকিফ।

আমি বক্তাও নহি। আমি কমবক্তার দলে। বক্তৃতায় যাঁহারা দিগ্বিজয়ী, বক্তিয়ার খিলজী, তাঁহাদের বাক্যের সৈন্য-সামন্ত অত দ্রুতবেগে কোথা হইতে কেমন আসে বলিতে পারি না। তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণ সেন অপেক্ষাও আমি বেশি অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহাদের বাণী আসে বৃষ্টিধারার মতো অবিরল ধারায়। আমাদের কবিদের বাণী বহে ক্ষীণ ভীরু ঝর্ণা-ধারার মতো। ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সংগীত-গুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়। পদ্মা ভাগীরথীর মতো খরস্রোতা যাঁহাদের বাণী, আমি তাঁহাদের বহু পশ্চাতে।

সার-সংক্ষেপ

লেখক মনে করেন তিনি ধ্যানীদের দলে। ধ্যানীরাই মানবজাতির কল্যাণ সাধন করেন। বনের পাখি যেমন নিজের আনন্দের গান করে, কবিও তেমনি নিজের আনন্দের জন্য যৌবনের গান গেয়ে চলেছেন।

কবি নিজেকে ভাল বক্তা মনে করেন না। তিনি কবি, তাই তিনি ছন্দের সুরে মানুষের মনে আনন্দ দিতে পারেন। বক্তাদের মতো শুধু কথার মায়াজালে মানুষকে তিনি আকৃষ্ট করতে পারেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. 'কবির স্বভাব গান করা' এ বাক্যটির অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।

২. ''পদ্মা-ভাগরথীর'মত খরস্রোতা যাহাদের বাণী, আমি তাহাদের বহু পশ্চাতে।'' এ-কথা কেন বলা হয়েছে।

উত্তর ॥ এ অংশটি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' প্রবন্ধের অন্তর্গত। কবি বাগ্মীদের সঙ্গে নিজের পার্থক্যকে অত্যন্ত সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে বিশ্লেষণ করেছেন।

মুসলমান তরুণসমাজের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে নজরুল এখানে রসিকতা করে বলেছেন তিনি ভাল বক্তা নন, তিনি কমবক্তার দলে। বক্তৃতায় যারা পারদর্শী তাঁরা এক নাগাড়ে কথা বলে মানুষকে অভিভূত করে রাখেন। কবির মতে বাগ্মীদের মুখে কথা আসে বৃষ্টির মত অবিরল ধারায়। বক্তৃতা শুনে তিনি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর হঠাৎ আক্রমণে হতবুদ্ধি লক্ষ্মণ সেনের চেয়ে বেশি অভিভূত হয়ে যান। কবিদের বাণী ক্ষীণ ঝর্ণাধারার মত। ছন্দের দু-কূল আকড়ে ধরে কবিদের কথা গুঞ্জন করতে করতে প্রবাহিত হয়। পদ্মা-ভাগীরথীর মতো তীব্র বেগে শব্দতুলে কবিদের কথা এগিয়ে চলে না। নজরুল এখানে বিনয়ের সঙ্গে নিজেকে কথা বলার ক্ষেত্রে বাগ্মীদের চেয়ে কম পারদর্শী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তিনি যে কবি সে পরিচয় এ উপমায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সাধুরীতি – আমার বলিতে দ্বিধা নাই যে, আমি আজ তাঁহাদেরই দলে, যাঁহারা কর্মী নন–ধ্যানী।

চলিতরীতি–আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমি আজ তাঁদেরই দলে, যাঁরা কর্মী নন–ধ্যানী।

সাধুরীতি– কাহারও ভালো লাগিলেও গাহি, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই।

চলিতরীতি–কারও ভালো লাগলেও গাই, ভালো না লাগলেও গেয়ে যাই।

সাধুরীতি– কাজেই আমি যে গান গাই, তাহা যৌবনের গান।

চলিত রীতি– কাজেই আমি যে গান গাই, তা যৌবনের গান

সাধুরীতি – ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া সে সঙ্গীত-গুঞ্জন করিতে করিতে বহিয়া যায়।

চলিতরীতি– ছন্দের দুকূল প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে সে সঙ্গীত গুঞ্জন করতে করতে বয়ে যায়।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- নজরুলের সাহিত্য রচনার প্রধান অবলম্বন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শব্দার্থ টীকা	মূলপাঠ

সম্বল – অবলম্বন।

তারুণ্য – তরুণের বিশেষণ।

সশ্রদ্ধ – শ্রদ্ধাসহ, শ্রদ্ধার সঙ্গে।

নমস্কার – প্রণাম, অভিবাদন।

জবাকুসুম সঙ্কাশ – জবা ফুলের মতো।

অরুণ – সূর্য।

স্তবগান – প্রশংসাসূচক গান।

তিমির বিদারী – তিমির বিদীর্ণ করে যা, অর্থাৎ অন্ধকার বিদীর্ণ করে যা, সূর্য।

আলোর দেবতা – সূর্য।

উদয় – আবির্ভাব।

অস্ত – বিলীন।

যৌবন-সূর্য – যৌবন রূপ সূর্য। রূপক কর্মধারয় সমাস।

তিমির-কুন্তলা – চুলের মতো কাল অন্ধকার। তিমির রূপ কুন্তলা। রূপক কর্মধারয়।

লীলাভূমি – ক্রীড়াক্ষেত্র।

নিশীথিনী – রাত।

পূজারী – উপাসক, পূজা করে যে।

মধ্যমনি – মাঝখানের রত্ন।

সানন্দে – আনন্দের সঙ্গে।

শির – মস্তক, মাথা।

দলভুক্ত – দলের একজন।

দলপতি – দলের নেতা।

শতদল – পদ্মফুল।

সিদ্ধি – সাধনায় সাফল্য লাভ।

মৃণাল – পদ্মফুলের ডাঁটা।

বিকশিত – প্রকাশিত।

আমার একমাত্র সম্বল আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে, যৌবনকে, আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি সেদিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছিলেন, জবাকুসুম-সঙ্কাশ তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ প্রভাতে তেমন সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগান গাহিয়াছি। তরুণ অরুণের মতোই যে তারুণ্য তিমির-বিদারী, সে যে আলোর দেবতা। রঙের খেলা খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত। যৌবন-সূর্য যেথায় অস্তমিত, দুঃখের তিমির-কুন্তলা নিশীথিনীর সেইতো লীলাভূমি।

আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালায় মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। আপনাদের মহাদান আমি সানন্দে শির নত করিয়া গ্রহণ করিলাম। আপনাদের দলপতি হইয়া নয়, আপনাদের দলভুক্ত হইয়া, সহযাত্রী হইয়া। আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শত দিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি। আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

সার-সংক্ষেপ

লেখক মনে করেন দেশের তরুণদের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর কাব্য রচনার সম্বল। যেদিন থেকে তিনি গান রচনা শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি যৌবনের অমিত শক্তিকে শ্রদ্ধা করেছেন। তিনি মনে করেন তারুণ্যই পারে সমস্ত অন্ধকার দূর করে মানব সমাজকে আলো দান করতে। তাই যেখানে যৌবনের সমাপ্তি সেখানেই দুঃখের সূচনা।

কবি যৌবনের পূজারী। তিনি চান তরুণদের সঙ্গে একাত্মতায় কাজ করতে। নেতা হবার ইচ্ছে তাঁর নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১. নজরুল তাঁর গান রচনার প্রথম থেকেই কাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং কেন?

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম তরুণদের উদ্দেশ্যে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর একমাত্র সম্বল হল তরুণদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও প্রাণের টান। যেদিন থেকে তিনি গান রচনা করতে শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি যৌবনের পূজারী এবং তরুণদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সূর্যের প্রথম আলো যেমন রাতের ঘন অন্ধকারকে দূর করে, তেমনি তারুণ্য বা যৌবনের শক্তিও জীবনের সমস্ত অন্ধকার এবং গ্লানি দূর করতে সক্ষম। সৃষ্টির আদিযুগে মানব সন্তান সূর্যের আলোকে দেবতা মনে করে পূজা নিবেদন করত। কারণ মানুষ দেখেছে রাতের বেলা অন্ধকারে জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। কিন্তু জবাফুলের মত রঙ নিয়ে যখন প্রথম সূর্যের আলোর আবির্ভাব হয়, তখন রাতের ভয় আর থাকে না। লেখক এ জন্য যৌবনকে আলোর দেবতা সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যৌবন যতদিন থাকে ততদিনই আনন্দ, আর যেদিন জীবন থেকে তারুণ্য বা যৌবন বিদায় নেয়, তখনই দুঃখের আরম্ভ হয়। যৌবনের এ অশেষ মহিমা লেখকের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। তাই তিনি যৌবনের জয়গানে মুখর।

২। "রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে তাহার উদয়, রঙ ছড়াইতে ছড়াইতে তাহার অস্ত।" একথা কেন এবং কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

চলিতরীতিতে রূপান্তর করুন

সাধুরীতি – আমাদের দলে কেহ দলপতি নাই, আজ আমরা শতাধিক হইতে শত শত তরুণ মিলিয়া তারুণ্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছি।

চলিতরীতি– ---

পাঠ ৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- যৌবন এবং বার্ধক্যের পার্থক্য বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।
- যৌবনের মাতৃরূপ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শব্দার্থ/টীকা	মূলপাঠ
বার্ধক্য – বৃদ্ধ অবস্থা, জরা, বৃদ্ধের বিশেষণ।	বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই-যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়-যাত্রার

আঁকড়িয়া – জাপটে ধরে রাখা।
মায়াচ্ছন্ন – যার সত্যিকার কোন অস্তিত্ব নেই এমন কিছুতে আচ্ছন্ন।
অভিনব – নতুন।
জয়যাত্রা – জয়ের জন্য যে যাত্রা।
বিঘ্ন – বাধা।
শতাব্দী – একশত বছর।
কুচকাওয়াজ – সৈনিকদের সমবেত।
জড় – প্রাণহীন।
অটল সংস্কার – যে বিশ্বাস টলেনা বা ভাঙেনা।
পাষাণ স্তূপ – পাথরের স্তূপ।
অরুণোদয় – সূর্যের উদয়।
নিদ্রাভঙ্গ – ঘুমভাঙ্গা।
রুদ্ধ – বন্ধ।
আলোক-পিয়াসী – আলোর জন্য যারা পিপাসার্ত।
কল–কোলাহল – হৈচৈ।
অভিসম্পাত – অভিশাপ।
জীর্ণ – প্রাচীন।
পুঁথি – হাতে লেখা বই।
নাভিশ্বাস – মৃত্যুকালীন শেষ নিঃশ্বাস ওঠা, মর মর অবস্থা।
অতিজ্ঞান – জ্ঞানের অসহনীয় অবস্থা।
অগ্নিমান্দ্য – পরিপাক শক্তি বা ক্ষুধা হ্রাস, অজীর্ণ রোগ।
কঙ্কালসার – হাড় সর্বস্ব।
ফ্রেম – কাঠামো।
নির্মেঘ – মেঘহীন।
জয়মুকুট – সাফল্যের জন্য যে মুকুট।
মেঘলুপ্ত – মেঘের আড়ালে হারানো।
মার্তণ্ড প্রায় – দুপুরের সূর্যের ন্যায়।
ঔদার্য – উদারতা।
বেদুইন – আরবের যাযাবর জাতি।
অসি – তরবারি।
বৈমানিক – যারা বিমান চালান।
অনন্ত – অন্ত নেই যার।
গৌরীশৃঙ্গ – হিমালয়ের চূড়া।
কাঞ্চন জঙ্ঘা – হিমালয়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম শৃঙ্গ।
শীর্ষদেশ – শিখর, উঁচুস্থান।

শুধু বোঝা নয়, বিঘ্ন, শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না; যাহারা জীব হইয়াও জড়; যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণ-স্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ তাহারাই—যাহারা নব অরুণোদয় দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকে; আলোক-পিয়াসী প্রাণ চঞ্চল শিশুদের কল-কোলাহলে যাহারা বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত করিতে থাকে, জীর্ণ পুঁথি চাপা পড়িয়া যাহাদের নাভিশ্বাস বহিতেছে, অতি জ্ঞানের অগ্নিমান্দ্যে যাহারা আজ কঙ্কালসার– বৃদ্ধ তাহারাই। ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য। বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাধাঁ যায় না। বহু যুবককে দেখিয়াছি– যাহাদের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি—যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরণের তলে মেঘ-লুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন। তরুণ নামের জয়-মুকুট শুধু তাহারই-যাহার শক্তি অপরিমাণ, গতিবেগ ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তি হীন যাহার উৎসাহ, বিরাট, ঔদার্য যাহার অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠিতলে। তারুণ্য দেখিয়াছি আরবের বেদুইনদের মাঝে, তারুণ্য দেখিয়াছি মহাসমরের সৈনিকের মুখে, কালাপাহাড়ের অসিতে, কামাল-করিম-মুসোলিনি-সানাইয়াৎ-লেনিনের শক্তিতে-যৌবন দেখিয়াছি তাহাদের মাঝে-যাহারা বৈমানিকরূপে অনন্ত আকাশের সীমা খুঁজিতে গিয়া প্রাণ হারায়, আবিষ্কারক রূপে সব-পৃথিবীর সন্ধানে গিয়া আর ফিরে না, গৌরীশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষদেশ অধিকার করিতে গিয়া যাহারা তুষারে ঢাকা পড়ে, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষা মণি আহরণ করিতে গিয়া সলিল সমাধি লাভ করে, মঙ্গলগ্রহে, চন্দ্রলোকে যাইবার পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। পবন গতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাহার উড়িয়া যাইতে চায়, নব নব গ্রহ-নক্ষত্রের সন্ধান করিতে করিতে যাহাদের নয়ন মণি নিভিয়া যায়। যৌবন দেখিয়াছি সেই দুরন্তদের মাঝে। যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি– শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে পথে গান গাহিয়া ভিখারী সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন সে দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বুকে আশা জাগায়।

নীল মঞ্জুষার মণি – এক প্রকার মূল্যবান রত্ন। **সলিল সমাধি** – পানিতে ডুবে যে মৃত্যু। **পবন গতি** – বাতাসের গতি। **যৌবনের মাতৃরূপ** – যৌবনের কোমল রূপ। **শব** – মৃতদেহ। **গোরস্থান** – মুসলমানদের কবরস্থান। **শ্মশান** – যেখানে হিন্দুদের শব দাহ করা হয়। **পরিচর্যা** – সেবা করা। **দুর্দশাগ্রস্ত** – খারাপ অবস্থায় পতিত। **হতাশা** – আশাহীন।	

টীকা

কালাপাহাড়

ইতিহাস-খ্যাত মুসলিম সেনাপতি। প্রথমে বাংলার নবাব সুলেমান কররাণী ও পরে দাউদের সেনাপতি হন। তার জাতি পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। কারও কারও মতে তিনি আদিতে হিন্দু-ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তার প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রাজকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ। পরে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবার অনেকের মতে তিনি আফগান মুসলিম। হিন্দুদের প্রতি তার প্রবল বিদ্বেষ ছিল।

কামাল

নব্য তুরস্কের জন্মদাতা। জীবনকাল ১৮৮১ তেকে ১৯৩৮। জন্ম তুরস্কের স্যালোনিকা নামক গ্রামের এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে। ১৯২২-এ এশিয়া মাইনর থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন। ১৯২৩-এ তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় তুরস্ক সার্বিক উন্নয়নের পথে ধাবিত হয়। ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি আমূল সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করেন।

করীম

জন্ম আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কোতে। রীফ গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট। সম্পর্ণ নাম মুহম্মদ ইবনে আব্দুল করীম। অসমসাহসী বীর যোদ্ধা ও কুশলী সংগঠক। ১৯২৪ সালে রীফ হতে স্পেনীয় সেনাদলকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন।

মুসোলিনি

সম্পর্ণ নাম সিনর বেনিটো মুসোলিনি। জন্ম ১৮৮৩ সালের ২৯ জুলাই ইটালির ভেরিয়ার প্রিদাপ্পিও নামক গ্রামে। পিতার নাম আলোসান্দ্রো। পেশায় তিনি ছিলেন একজন কর্মকার। মুসোলিনির কর্মজীবন শুরু স্কুল শিক্ষক হিসেবে। ১৯১৭-এ গঠন করেন ফ্যাসিস্ট পার্টি। ১৯২২-এ হন ইটালির প্রধানমন্ত্রী। তাঁর প্ররোচনায় ইটালি আবিসিনিয়া অধিকার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহেই ইটালি জার্মানীর সাথে যোগ দেয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরে ইটালি মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হয়। ২৫ জুলাই, ১৯৪৩-এ পদচ্যুত ও বন্দী হন। কিছুকাল পর জার্মানীর সহায়তায় মুক্তিলাভ ও পুনরায় ইটালির শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসেন। ক্ষমতাগ্রহণের দু'বছর পর আততায়ীর হাতে নিহত হন।

সান ইয়াৎ

চীনা রাজনীতিবিদ। নবচীনের জন্মদাতা। জীবনকাল ১৮৬৬-১৯২৫। জন্ম ক্যান্টনের অন্তর্গত কোয়হা নামক গ্রামে। বিপ্লবী জীবনের সূচনা ১৮৯২ সালে। ১৮৯৫ এর ব্যর্থ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। পরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রমণ করে বিদ্রোহীদের সংঘবদ্ধ করেন। সফল বিদ্রোহের মাধ্যমে মাঞ্চু রাজবংশের পতন হয় ১৯১১ সালে। পরবর্তীতে অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি চীন গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হন। অন্যান্যদের সাথে মতানৈক্যের কারণে স্বল্পকাল পরই পদত্যাগ করেন। ১৯১৭ সালে চীনের সামরিক সরকারের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের পর ১৯২৩ সালে ক্যান্টনে তার ক্ষমতা সংহত করতে সক্ষম হন। কুওমিংটাং দলের অভ্যুত্থান ঘটে এ সময় থেকেই। চিয়াং কাইশেক ছিলেন তার সেক্রেটারী। সানইয়াৎ রাজনীতি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

লেনিন

সোভিয়েত রাষ্ট্রের জনক। প্রকৃত নাম ভ্লাদিমির ইলিচ। জন্ম ১০ এপ্রিল, ১৮৭০ সিমবিরস্ক নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কসের ভাবশিষ্য হন সিমবিরস্ক জিমনাসিয়াম বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগদানের পর ১৮৮৬ সালে নির্বাসিত হন। পরবর্তীতে দেশে ফেরার অনুমতি পেয়ে সেন্ট পিটার্স বার্গে কয়েক বছর আইন ব্যবসা করেন। বৈপ্লবিক তৎপরতা ও পত্রিকা সম্পাদনার অপরাধে ১৮৯৬ সালে এক বছরের কারাভোগ ও সাইবেরিয়ায় তিন বছরের নির্বাসন দণ্ড পান। নির্বাসিত অবস্থাতেই বিয়ে করেন নাদেজদা নামক এক মহিলাকে। মুক্তি পাওয়ার পর মিউনিকে ফিরে ইসক্রা নামক পত্রিকা বের করেন। ১৯০৩ সালে লন্ডনের কংগ্রেসে বলশেভিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৪ সালে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পত্রিকা New life প্রকাশ্যে বের করেন। ফলে পুনরায় নির্বাসিত হন এবং বারো বছর সুইজারল্যাণ্ডে থাকেন। ১৯৩৭ সালে রাশিয়ায় ফিরে জনমত সংগঠিত করেন এবং কেরেনস্কি মন্ত্রী মন্ডলের পতন ঘটান। এ বছরেই নৌ এবং স্থল সৈন্যের বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করেন। এ সময়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন চারপাশে শত্রুপরিবেষ্টিত হয়েও লালফৌজের সহায়তায় তিনি উদ্ধার পান। ১৯২১ সাল হতে জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু স্বল্পকাল পরই পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ২১ জানুয়ারি, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সার-সংক্ষেপ

লেখক মনে করেন যারা পুরাতনকে আঁকড়ে থাকে, মিথ্যা কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে মানুষের নতুন কিছু করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তারা জীব হয়েও জড়ের মতো। এরা নতুন কিছুর আগমনে ভীত হয়ে ওঠে। কেবল বয়স দিয়ে বার্ধক্য নির্ধারিত হয় না। যুবক হয়ে অনেকে বৃদ্ধের মতো আচরণ করে। অন্যদিকে অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিও মন-মানসিকতায় যুবকদের মতো হয়েও থাকে। তারুণ্যের লক্ষণ প্রাণপ্রাচুর্য, অমিত তেজ, অটল সাধনা ও মৃত্যুকে উপেক্ষা করার মতো সাহস। আকাশ বিজয়ী বৈমানিকদল, পর্বতশীর্ষে আরোহনকারী দুঃসাহসী অভিযাত্রীদল, সমুদ্রের রহস্য সন্ধানী ডুবুরী, নতুন গ্রহ-নক্ষত্র সন্ধানীরা সবাই পরিপূর্ণ যৌবনের প্রতীক। যৌবনের মাতৃরূপ পরিলক্ষিত হয় সেবা এবং সহানুভূতিশীলদের মাঝে, দুর্বলের মধ্যে যারা সাহসের সঞ্চার করে, আশাহীনদের যারা আশার বাণী শোনায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন

১। "বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাধা যায় না"। উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

যৌবনের মাতৃরূপ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলাম "যৌবনের গান" প্রবন্ধে যৌবনের বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখক যেহেতু যৌবনের পূজারী, তাই এর কোমল ও কঠোর দুই দিকই সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তরুণেরা এদিকে নিত্যনতুন আবিষ্কার করে মানব সমাজকে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, অন্যদিকে রয়েছে তরুণদের কোমল রূপ। লেখক তরুণদের সেবামূলক কর্মতৎপরতাকে যৌবনের মাতৃরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। শবদেহ বহন করে নিয়ে যায় শ্মশান ঘাটে, গোরস্থানে সুষ্ঠু সৎকারের জন্য, নিজে অনাহারে থেকে সে অন্ন তুলে দেয় দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িতদের মুখে, যার কোন বন্ধু নেই সে অসুস্থ হলে রাতের পর রাত জেগে সেবা করে, পথে পথে গান গেয়ে দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য টাকার যোগাড় করে। এককথায় অসহায়ের মনে আশার সঞ্চার করে, দুর্বলের পাশে ভরসা হয়ে দাঁড়ানোকে লেখক যৌবনের মাতৃরূপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। মা যেমন নিজের কষ্ট উপেক্ষা করে সন্তানের জন্য, তরুণেরাও তেমন নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের দুঃখ দূর করার পবিত্র দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়। তরুণদের এ সেবাধর্মকে লেখক যৌবনের মাতৃরূপ হিসেবে বর্ণনা করে যৌবনকে পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

চলিত ভাষার রূপান্তর করুন

সাধুরীতি – বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

চলিতরীতি– ----------।

সাধুরীতি – বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি।

চলিতরীতি – ----------।

পাঠ ৪

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- নজরুল মুসলিম তরুণদের কাছে কী আশা করেন তার বিবরণ লিখতে পারবেন।

শব্দার্থ	মূলপাঠ
সেনানিবাস – সৈনিকদের আবাস। **অকুণ্ঠিত** – দ্বিধাহীন হৃদয় যাদের। **মুরীদ** – শিষ্য। **মহ্মা** – মহান আত্মযার। **অট্টালিকা** – বড় দালান। **জীর্ণ** – পুরাতন। ধ্বংসপ্রায়। **সংস্কারাতীত** – মেরামত করা যায় না যা।	ইহাই যৌবন, এ ধর্ম যাহাদের তাহারাই তরুণ। তাহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই। দেশ–কাল–জাতি ধর্মের সীমার ঊর্ধ্বে ইহাদের সেনানিবাস। আজ আমরা - মুসলিম তরুণেরা-যেন অকুণ্ঠিত চিত্তে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি-ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য যৌবন। আমরা সকল দেশের সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরীদ যৌবনের। এ জাতি-ধর্ম-কালকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে যাঁহাদের যৌবন, তাঁহারাই আজ মহামানব, মহাত্মা মহাবীর। তাঁহাদিগকে সকল দেশের সকল ধর্মের সকল লোক সমান শ্রদ্ধা করে। পথ-পার্শ্বের ধর্ম অট্টালিকা আজ পড়-পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়াই আমাদের ধর্ম, ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে, তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদের মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা

গড়বার – তৈরি করার। **নিয়ামত** –অনুগ্রহ। **মোনাজাত** – প্রার্থনা। **বেহেশতী** – স্বর্গীয়।	তরুণেরই। খোদার দেয়া এ পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মোনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশতী চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য,ভিখারীর মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো গড়িয়া লইব। ইহাই হউক তরুণের সাধনা।

সার-সংক্ষেপ

বিশ্বের সমস্ত তরুণদের একই ধর্ম। তাই তরুণরা দেশ-কাল জাতি ধর্মের উর্ধ্বে। আর যারা এ ধর্ম ও কালকে অতিক্রম করতে পেরেছেন তারাই মহামানব হিসেবে সকল দেশের সকল মানুষের কাছে সমান শ্রদ্ধা লাভ করতে পেরেছেন।

ধর্মের মাঝেও কিছু কুসংস্কার আছে, যা দূর করার সময় এসেছে। যে ধর্মরূপ অট্টালিকা আমাদের আশ্রয় দান করেছে, তা নতুন করে সংস্কার করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে মুসলিম তরুণদের। আল্লাহ আমাদের যে উদ্দেশ্যে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা আমাদের সফল করতে হবে। এ পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে বেহেশত এবং বেহেশতী বস্তু অর্জন করার সাধনা করে এ পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার দায়িত্ব তরুণদের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

☞	নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন।

নমুনা উত্তর

১. লেখক মুসলিম তরুণদের কাছ থেকে কী আশা করেন?

"যৌবনের গান" প্রবন্ধটি মুসলিম তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে দেয়া একটি ভাষণের অংশ বিশেষ। কবি মুসলিম তরুণদের সত্যিকার তারুণ্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। যৌবনের অপরিমেয় শক্তি, বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, অটল জীবন সাধনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যেন মুসলিম তরুণ সমাজের প্রাণের মন্ত্র হতে পারে সেটাই কবির একান্ত কামনা। তারুণ্যের এই ধর্ম দেশ-কাল-জাতি ধর্মের উর্ধ্বে। তিনি তাই মনে করেন ধর্ম আমাদের ইসলাম, কিন্তু প্রাণের ধর্ম আমাদের তারুণ্য, যৌবন। লেখক মনে করেন, আল্লাহ এ পৃথিবীতে সবই দিয়েছেন। মানুষকে দিয়েছেন সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা। মানুষকে তার কর্ম এবং সাধনার দ্বারা এ পৃথিবীতেই স্বর্গীয় বস্তু অর্জন করতে হবে। আল্লাহ হাত দিয়েছেন কাজ করার জন্য, অন্যের দ্বারস্থ হওয়া মানে বিধাতার দেয়া মর্যাদাকে অপমান করা। লেখকের আকাঙ্ক্ষা মুসলিম তরুণ সমাজ পূর্ণ যৌবন শক্তির অধিকারী হয়ে সমস্ত কুসংস্কারের বাধা অতিক্রম করে এ পৃথিবীতে তাদের সম্মানজনক আসন প্রতিষ্ঠিত করবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

☞	নিচের রচনামূলক প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য-উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে, সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে সব প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়নি, সেগুলো নিজে লিখুন।

১। যৌবনের গান প্রবন্ধের মূল বক্তব্য লিখুন।

২। যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসরণে তারুণ্য ও বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ধারণ করুন।

১। যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসরণে তারুণ্য ও বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ধারণ করুন।

উত্তর : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'যৌবনের গান' প্রবন্ধে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ তেজোদীপ্ত ভাষায় সম্পর্ণ বিপরীত মেরুর দুই ভিন্ন সত্তা তারুণ্য ও বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন। তারুণ্য এবং বার্ধক্যের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি গতানুগতিক বয়সের মাপকাঠিকে অতিক্রম করে মানুষের মন-মানসিকতার আলোকে যৌবন ও বার্ধক্যের পার্থক্য করেছেন।

সাধারণ অর্থে আমরা নবীন বয়সীদেরই তরুণ বলে আখ্যায়িত করি। এরাই তারুণ্যের অধিকারী বলে মনে করি। কিন্তু নজরুল এ সঙ্কীর্ণ সীমারেখায় তারুণ্যকে সীমাবদ্ধ করেননি। তিনি বলেছেন, "বহু যুবককে দেখিয়াছি যাহাদের যৌবনের উর্দির নিচে বার্ধক্যের কঙ্কাল মূর্তি। আবার বহু বৃদ্ধকে দেখিয়াছি যাহাদের বার্ধক্যের জীর্ণাবরনের তলে মেঘ লুপ্ত সূর্যের মতো প্রদীপ্ত যৌবন।" এ বক্তব্যে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বয়স বাড়লেই মানুষ বৃদ্ধ হয়না। বৃদ্ধ তারাই যারা পুরাতনকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে পড়ে থাকে। এদের মধ্যে জীবের মতো প্রাণচাঞ্চল্য নেই বলে এরা জড়ের মতো নিস্প্রাণ। তাই নতুন যাত্রাপথে এরা পা মিলিয়ে চলতে পারে না। পুরাতন ধ্যান-ধারনা প্রাচীন সংস্কারের নিচে মাথা গুজে পড়ে থাকে। এরা তাই চলার পথের শুধু বোঝা নয়, বিঘ্নও বটে। এ কারণেই লেখক বয়স নয় এবং বরং এমন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীদেরই বৃদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

আর তরুণ হল তারাই যাদের প্রাণশক্তি অপরিসীম, বিপুল যাদের আশা, উৎসাহে যাদের কখনো ভাটা পড়ে না। এরা নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত থাকে; মৃত্যুভয়কে এরা জয় করেছে। তাই এরা কখন গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া জয় করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক তুষারে হারিয়ে যায়, আকাশের রহস্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আর ফেরে না, অতল সমুদ্রের নীল মঞ্জুষার মণি আনতে গিয়ে পানিতে হারিয়ে যায়। কখনো বা এরা দুঃখ পীড়িত অনাহারীদের কাছে এগিয়ে যায় মমতার স্পর্শ নিয়ে। স্বজনহারা মানুষ অসুস্থ হলে রাত জেগে মায়ের মতো সেবা করে। শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে বন্যাপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় শান্তির কোমল আশ্রয় হিসাবে। যৌবন এখানে মায়ের স্নিগ্ধ কোমলরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। কবি মনে করেন এ সমস্ত গুণ যাদের মাঝে দেখা যায় তারাই তরুণ এবং তারাই যৌবনের অধিকারী। তাই কবি যৌবনকে দেখেন কালাপাহাড়ের তরবারিতে, আরবের বেদুইনদের প্রাণশক্তিতে, কামাল, করিম মুসোলিনী ও লেনিনের মধ্যে। কারণ এরা সবাই জাতির দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন মনোবলের সঞ্চার করেছেন। দেশ ও জাতির অগ্রযাত্রার জন্য নিজের স্বার্থকে তুচ্ছ করে তাঁরা পৃথিবীর বুকে নিজের দেশকে বড় করে তুলেছেন। তাই আজ সমস্ত বিশ্বের মানুষ এঁদের চেনে।

কবি মুসলিম তরুণ সমাজের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন তারুণ্যের অপরিমেয় গতিময়তা ও প্রাণ প্রাচুর্যে উদ্দীপ্ত হয়ে মুসলমানদের জন্য নতুন সমাজ এবং নতুন যুগ গড়ে তোলে। কারণ তরুণরাই পারে পুরাতন ঘুণে ধরা জীর্ণ সমাজ ভেঙে নতুন করে গড়তে। অশিক্ষা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রক্ষণশীল প্রবীণেরা সামনে চলার পথকে রুদ্ধ করে রেখেছে। সেই রুদ্ধপথকে ভেঙে নতুন আলো ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব যারা নেবে তারাই তরুণ। সর্বকালে সর্বযুগে তরুণরাই সমস্ত অন্ধকারের বেড়াজাল ছিন্ন করে মানুষের মুখে নতুন আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়। এভাবে লেখক তারুণ্য ও বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্য ও ধর্মের পার্থক্য নির্ধারণ করে শেষ পর্যন্ত বলিষ্ঠভাবে যৌবনের জয়গান গেয়েছেন।

প্রশ্ন : কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' প্রবন্ধ অনুসরণে যৌবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

উত্তর : কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' প্রবন্ধটির নামের মাঝেই সুস্পষ্ট যে এখানে যৌবনের প্রশংসা করা হয়েছে। যৌবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যৌবন বলতে তিনি এখানে তারুণ্যের কথা বলেছেন। আমরা সাধারণত মনে করি তরুণদেরই কেবল তারুণ্য আছে। কিন্তু লেখক এখানে বয়স দিয়ে যৌবনকে বিচার না করে মন-মানসিকতাকে যৌবনের মাপকাঠি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যার ফলে যৌবনের বৈশিষ্ট্যগুলি লেখকের বক্তব্যের মাঝে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে।

অনেক সময় যুবক হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মধ্যে প্রবীণদের মতো পুরাতন সংস্কার নিয়ে বেঁচে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। আবার কখনও দেখা যায় বৃদ্ধের মনেও এমন প্রাণ প্রাচুর্য আছে, যার ফলে তিনি সহজে নতুনকে বরণ করে নিতে পারেন। যৌবনের শক্তি অপরিসীম, গতিবেগ ঝড়ের মতো, যার তেজ আষাঢ় মাসের মধ্য আকাশের সূর্যের মতো।

বিপুল যার আশা, সাধনার পথে হাজার বাধা এলেও অটল থাকে, মানব জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে তারাই তরুণ। কবি যৌবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের মাঝে যারা অন্তহীন, আকাশের সীমা খুঁজতে যায়, নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় দুর্বার অভিযানে বের হয়ে যারা আর ফেরে না, অজানাকে জানার নেশায়, অচেনাকে চেনার নেশায় যারা জীবন দেয়। নিপীড়িত, দুঃস্থ মানুষের সেবায় যারা এগিয়ে আসে, হতাশাগ্রস্ত দের মনে আশার বাণী জাগ্রত করে নবজীবনের আশ্বাস দান করে তাদের মাঝে। যৌবনই মানব জীবন থেকে সমস্ত অন্ধকার দূর করে আলোর বন্যা এনে দিতে পারে। সমস্ত জীর্ণতা, কুসংস্কার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার সাহস থাকে তাদের। যৌবনের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর যাদের জীবন তারা সব সময় পরের কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবন নিয়োজিত করে। সেজন্যই কবি মনে করেন এ প্রাণ প্রাচুর্য না থাকলে সে যেমন বৃদ্ধের মতো, তেমনই যদি বয়স বেশি হলেও মন-মানসিকতার দিক দিয়ে যৌবনের চাঞ্চল্য ভরপুর হয়, তবে তাকে তরুণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিরাই সমাজ থেকে, জীবন থেকে সমস্ত জীর্ণতাকে, পুরাতনকে, কুসংস্কারকে দূর করে মুসলিম জাতিকে সম্মানের সাথে বসবাস করার মত নতুন পৃথিবী গড়ে দেবে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন।

১। আমরা সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ধর্মের, সকল কালের। আমরা মুরীদ যৌবনের।

২। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশত ও বেহেশতী চিজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারীর মতো হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িয়া লইব।

তারুণ্যের ভরা ভাদরে আজও না ওয়াকিফ।

আলোচ্য অংশটুকু কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'যৌবনের গান' নামক প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে কবি নিজের কাব্য রচনার পটভূমি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।

কবি মনে করেন, তিনি বনের পাখির মতোই নিজের মনের আনন্দে গান করেন। যেহেতু তিনি মনে করেন যৌবনের সীমা পরিক্রমন তার শেষ হয়নি, তাই তিনি যে গান করেন তা যৌবনেরই গান। তিনি তরুণদের আকর্ষণ করার জন্যে বিশেষভাবে এমন গান করেননি, কবির এই গান যে তরুণদের মনে উন্মাদনা জাগিয়েছে সেটা হয়েছে তার অগোচরে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পৃথিবীতে সমুদ্রের বুকে জোয়ার ভাটা হয়, এটা যেমন চাঁদের জানা নেই, তেমনি কবির নিজের মনের আনন্দ সৃষ্টির জন্য যে কাব্য রচনা করেন তা যে তরুণদের অনুপ্রেরণা জোগায় তাও কবির জানা নেই। কবি এখানে চমৎকার উপমার সাহায্যে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার সৃষ্টি এবং কবির রচনায় তরুণদের অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন।

আমরা সকলে মিলিয়া এক সিদ্ধি, এক ধ্যানের মৃণাল ধরিয়া বিকশিত হইতে চাই।

উত্তর ॥ আলোচ্য অংশটুকু কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'যৌবনের গান' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। লেখক তরুণদের সাথে একাত্মা প্রকাশ করতে গিয়ে এ চমৎকার উপমাটি ব্যবহার করেছেন।

তরুণদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই কবির একমাত্র পাথেয়। কারণ একমাত্র তারুণ্যই পারে সমস্ত অন্ধকার দূর করে আলোর ধারা বইয়ে দিতে। কবির গানে তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্য দেখে তরুণেরা তাঁকে যে ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা দিয়েছে তা কবি মহা আনন্দে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাই বলে কবি তাদের নেতা হতে চান না। পদ্ম যেমন শত পাঁপড়িসহ একটি মৃণাল বা ডাঁটা অবলম্বনে ফুটে ওঠে, তেমনি কবিও শত শত তরুণদের সঙ্গে একই সাথে বিকশিত হতে চান। কারণ কবির এবং তরুণদের একই উদ্দেশ্য ধ্যান। মুসলিম সমাজের মধ্যে তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া বইয়ে দেয়াই

তাদের উদ্দেশ্য। তাই কবি মনে করেন দলপতি না হয়ে তরুণদের সঙ্গে ওদেরই একজন হয়ে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করাই হবে তার উদ্দেশ্য।

বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ব্যাখ্যেয় অংশটুকু যৌবনের পূজারী কাজী নজরুল ইসলামের 'যৌবনের গান' নামক প্রবন্ধের অন্তর্গত। বয়স দিয়ে যে বার্ধক্যকে নির্ণয় করা যায় না, এ সত্যটিকে লেখক এখানে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

লেখকের ভাষায় বয়স দিয়ে নয় মানুষের কর্মশক্তি ও মানসিক সজীবতার মাধ্যমেই তরুণ ও বৃদ্ধদের স্বরূপ চিহ্নিত করা উচিত। যারা প্রাচীনকে, জীর্ণতাকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় তারাই বৃদ্ধ। এরা সব সময় নতুন কিছুকে গ্রহণ করার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর যারা সব সময় নতুনকে বরণ করে নেবার জন্য উন্মুখ, মনের উদার আলোকে নতুন কিছু সৃষ্টির জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করে তারাই তরুণ। বয়সে প্রবীণ বা স্থবির হলেই তাকে বার্ধক্যের গণ্ডীতে ফেলা যাবে না। কারণ অনেক বৃদ্ধ আছেন যারা নতুন পৃথিবীর স্বপ্নে বিভোর, প্রগতিশীল জীবনে যারা আস্থাবান, সামনে এগিয়ে যাওয়া যাদের একমাত্র ধর্ম। তারা বয়সে প্রবীন হলেও যৌবন-ধর্মের বিচারে তারা তারুণ্যের অধিকারী। তাই বয়সের সংকীর্ণ সীমারেখায় বার্ধক্যকে পরিমাপ করা উচিত নয়। বার্ধক্য এবং তারুণ্য বিচার করতে হবে মানুষের কর্মচেতনা, বিশ্বাস ও সৃষ্টিশীল মন-মানসিকতার দ্বারা। কাজেই বয়স যা-ই হোক না কেন সৃষ্টিধর্মীতা যার মনে ক্রিয়াশীল সে-ই তরুণ। সে কারণেই কবি বলেছেন বার্ধক্যকে বয়সের ফ্রেমে বাধা যায় না।

ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন

☞	পঠিত রচনাটির কিছু ভাষা-বিষয়ক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। এগুলোর সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর লিখে দেয়া হয়েছে- সেগুলো ভালভাবে পড়ুন। যেগুলো দেয়া হয়নি- সেগুলো নিজে নিজে করুন।

প্রশ্ন : নিচের অংশটুকু সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করুন।

"তারুণ্যকে, যৌবনকে, আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি, সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি, জবাকুসুম সঙ্কাশ, তরুণ অরুণকে দেখিয়া প্রথম মানব যেমন করিয়া সশ্রদ্ধ নমস্কার করিয়াছিলেন, আমার প্রথম জাগরণ প্রভাতে তেমন সশ্রদ্ধ বিস্ময় লইয়া যৌবনকে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, তাহার স্তবগান গাহিয়াছি।"

সৃজনশীল কাজ

বর্তমান বাংলাদেশের তরুণদের সাধনা কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে আপনার মতামত প্রবন্ধের আকারে লিখুন।

আরও যা পড়তে পারেন

কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ছাড়াও তাঁর উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, পড়তে পারেন। এগুলো পাওয়া যাবে–'নজরুল রচনাবলী'-তে।